বিশ্ববিপ্লবের প্রাসঙ্গিকতা : একটি মার্কসীয় বিশ্লেষণ

সিত্তুল মুনা হাসান*

[**সার-সংক্ষেপ:** মার্কসীয়-লেনিনীয় তত্ত্বে বিশ্ববিপ্লবের যে ধারণা দেয়া হয়েছে তার সমকালীন প্রাসঙ্গিকতা বর্তমান প্রবন্ধে বিশ্লেষণ করে দেখা হয়েছে। লেনিনপ্রদত্ত বিপ্লবের শর্তগুলো বর্তমান পুঁজিবাদী বিশ্বব্যবস্থায় কতটুকু কার্যকর তা যাচাই করতে গিয়ে অর্থনৈতিক অসমতা, পুঁজিবাজারে অস্থিরতা, দারিদ্র, রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন, শরণার্থী সমস্যা, বর্ণবাদ ও যুদ্ধ অর্থনীতির নানা সংকট পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। অর্থাৎ, পুঁজিবাদ নব্য-রক্ষণশীল পর্যায়ে এসে তার অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্বকে আরো প্রকট করে তুলেছে।]

মার্কস ও এঙ্গেলস দেখিয়েছিলেন, বুর্জোয়া ও প্রলেতারিয়েতের সংঘাত গভীরতর হয়ে উঠলে একটি সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পথ সুগম হবে। একটি দেশে বিপ্লব সফল হলে ধীরে ধীরে তা বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়বে। সেসময়কার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট বিবেচনা করে মার্কস উন্নত পুঁজিবাদী দেশ থেকে বিপ্লব সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ার ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। কিন্তু মার্কসের সময়টি পুঁজিবাদের বিকাশের যুগ। এক শতাব্দী পর পুঁজিবাদ সাম্রাজ্যবাদে রূপান্তরিত হয়ে এক চূড়ান্ত প্রতিক্রিয়াশীল পর্যায়ে উপনীত হয়। লেনিন এ নতুন পর্বে এক নতুন ধরনের বিপ্লবতত্ত্ব হাজির করেন। তিনি দেখান, সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থার অধীনে থেকে উন্নয়ন অসম্ভব। কারণ পুঁজিবাদী গণতন্ত্র সংখ্যালঘিষ্ঠ ধনিক শ্রেণীর স্বার্থে পরিচালিত এবং এ রাষ্ট্রব্যবস্থা হয়ে ওঠে সংখ্যালঘিষ্ঠ কর্তৃক সংখ্যাগরিষ্ঠকে শোষণের যন্ত্র। নিও-ক্ল্যাসিকাল অর্থনীতিবিদ এ্যাডাম স্মিথ বিষয়টি অত্যন্ত খোলাখুলিভাবেই প্রকাশ করেছিলেন। তাঁর ভাষায়, 'যতদিন সম্পত্তি থাকবে ততদিন এমন কোনো সরকার থাকবে না, যার মূল উদ্দেশ্য সম্পদ নিরাপদ রাখা এবং গরিবদের হাত থেকে ধনীদের রক্ষা করা নয়।' কিন্তু প্রাচীন এথেন্স থেকে আজবধি গণতন্ত্রের যেসব তাত্ত্বিক ধারণা প্রচলিত আছে তার উদ্দেশ্য ঠিক বিপরীত, অর্থাৎ ধনীদের হাত থেকে দরিদ্রদের রক্ষা করা।[১] এ প্রকৃত গণতন্ত্র, শান্তি ও জাতীয় প্রগতি প্রতিষ্ঠার জন্য মানুষের আন্দোলনই একসময়ে বিপ্লবে রূপ নেবে বলে লেনিন মনে করতেন।

* **ড. সিত্তুল মুনা হাসান:** সহযোগী অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

লেনিনের দৃষ্টিতে, সাম্রাজ্যবাদের প্রাথমিক ও সর্ববৃহৎ উদ্দেশ্য স্বদেশে ও বিদেশে গণতন্ত্রের নীতিমালা লংঘন করা। এক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদকে গণতন্ত্রের অস্বীকৃতি বলে অভিহিত করা যায় বলে তিনি মনে করতেন। রাষ্ট্রীয় একচেটিয়াতন্ত্র কায়েমের মাধ্যমে পুঁজিবাদ এখন বিস্তৃতি লাভ করেছে। একচেটিয়াতন্ত্র সমৃদ্ধ করা এবং প্রলেতারীয় আন্দোলন ও জাতীয় মুক্তির সংগ্রামকে থামিয়ে দেয়ার জন্য পুঁজিবাদী ব্যবস্থা একচেটিয়াতন্ত্র ও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার সম্মিলনে এমন এক রাষ্ট্রযন্ত্র গড়ে তোলে যার কাজ হচ্ছে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা রক্ষা করা এবং আগ্রাসী যুদ্ধকে উসকে দেয়া। এক্ষেত্রে রাষ্ট্র হয়ে ওঠে একচেটিয়া এলিটদের নির্বাচিত ব্যক্তিবর্গের শাসনব্যবস্থা। এ সম্পর্কে কমিউনিস্ট ইশতেহারে মার্কস ও এঙ্গেলস বলেছিলেন, 'আধুনিক রাষ্ট্রের নির্বাহী শাখা হচ্ছে সমস্ত বুর্জোয়াদের সাধারণ বিষয়গুলো দেখাশুনা করার একটি পরিষদ'। এ কথার মাধ্যমে মার্কস ও এঙ্গেলস নির্বাহী শাখার বিশেষ শ্রেণী কার্যক্রম স্বীকার করেছেন।[২] এই পুঁজিপতি শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষার জন্য রাষ্ট্র উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সর্বক্ষণিক হস্তক্ষেপ এবং বিভিন্নভাবে এর উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত করে। আর একচেটিয়া প্রতিষ্ঠানগুলোর সম্ভাব্য সর্বোচ্চ মুনাফা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে অর্থনীতির স্বতন্ত্র শাখাগুলোর দায়িত্ব গ্রহণ করে। এ লক্ষ্যে তারা স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের নামে এক ধরনের প্রতিক্রিয়াশীল নীতি গ্রহণ করে, যা সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের কাছে অর্থহীন বলে প্রতিপন্ন হয়। তাই পুঁজিবাদের মুক্ত বিশ্ব হয়ে ওঠে কোটি মানুষের বেকারত্বের দুর্দশা। অন্য কথায়, বুর্জোয়া ব্যবস্থা সকলের কাজ পাবার অধিকার নিশ্চিত করতে পারে না, দিতে পারে না অবসর ও সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার।[৩] উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, সম্প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ওবামা সরকার 'পেশেন্ট প্রটেকশন অ্যাক্ট' ও 'অ্যাফোর্ডেবল কেয়ার অ্যাক্ট' নামে দুটি আইনের মাধ্যমে দরিদ্রবান্ধব জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থা প্রবর্তন করে। এ জনকল্যাণমুখী আইন বাতিলের দাবিতে বিরোধী রিপাবলিকানরা ২০১৪ অর্থবছরের বাজেট অনুমোদন থেকে বিরত থাকে। এতে জনপ্রশাসনের প্রায় আট লাখ কর্মকর্তা কর্মচারীর বেতন-ভাতা বন্ধ হয়ে যায়, লে-অফ হয়ে যায় তাদের চাকরি। চিকিৎসাসহ অনেকগুলো সামাজিক সেবা ব্যবস্থায় সৃষ্টি হয় অচলাবস্থা। পুঁজিবাদের এই ভয়ানক গণবিরোধী কার্যক্রম তাদের মধ্যে মধ্যপন্থী ও উদারপন্থী সমর্থকদেরও বিচলিত করে তোলে। মানুষের সামাজিক নিরাপত্তা হরণকারী এ আত্মঘাতী রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রতি তাই ক্রমশ জনঅসন্তোষ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

এ জনঅসন্তোষ রুখে দিতে সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থার অধীনে ফিন্যান্সিয়াল অলিগর্কি সর্বোচ্চ প্রতিক্রিয়াশীল নীতি গ্রহণ করে। এতে এক ধরনের সন্ত্রাসবাদী একনায়কতন্ত্রের সূত্রপাত ঘটে যা পরবর্তীতে ফ্যাসিবাদে রূপ নেয়। এ ফ্যাসিবাদী শাসন ব্যবস্থা সামরিক ও পুলিশ বাহিনী ব্যবহার করে জনগণের ক্ষোভ দমন করে। বৃহত্তম একচেটিয়া প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রতি রাষ্ট্রের পূর্ণ আনুগত্য, অর্থনীতির সামরিকায়ন,

রাষ্ট্রযন্ত্রের বিস্তার ঘটানো, শ্রমজীবী মানুষের সাম্যবাদী আন্দোলনের বিরুদ্ধে উন্মত্তভাবে আঘাত হানা, শান্তিবাদী ও অন্যান্য প্রগতিশীল প্রতিষ্ঠানের সদস্যদের নির্যাতন ও শাস্তি প্রদান, বর্ণবৈষম্য এবং গণতান্ত্রিক স্বাধীনতার সামান্য সম্ভাবনার পথকে অঙ্কুরেই বিনাশ সাধন হচ্ছে আজকের সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলোর অভ্যন্তরীণ নীতি।[৪]

অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার নামে মার্কিন সরকার তার দেশের জনগণের ওপর কি ধরনের নীতি চাপিয়ে দিচ্ছে তার একটি দৃষ্টান্ত দেয়া যেতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রে ফুড স্টাম্পসহ গরিবদের সমর্থনের নানা খাতে ব্যয় এখন প্রায় ৬০ বিলিয়ন ডলার যা হ্রাস করার জন্য প্রবল চাপ বিদ্যমান। অপরদিকে, এ দেশেই এখন কারাগারের পেছনে বার্ষিক ব্যয় ৮০ বিলিয়ন ডলার। বিশ্বে যুক্তরাষ্ট্রই এখন বৃহত্তম কারাগার অর্থাৎ বিশ্বে যুক্তরাষ্ট্রেই সবচেয়ে বেশিসংখ্যক মানুষ কারাগারে বাস করে। নানা রকম ভর্তুকি, কর সুবিধা, নিয়ন্ত্রণহীন ক্ষতিকর বিনিয়োগ ও জালিয়াতি, দেশে দেশে অবাধ তৎপরতা শতকরা ১ ভাগের কম জনসংখ্যার ক্ষুদ্র একটি গোষ্ঠীর উচ্চ আয়ের উৎস। সরকারি হিসাব অনুসারেই,এই শতকরা ১ ভাগের আয় দেশের শতকরা প্রায় ২৫ ভাগ, আর শতকরা প্রায় ৪০ ভাগ সম্পদ তাদের দখলে।[৫] তাদের এ দখলদারিত্বের খায়েশ মেটাতে যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বব্যাপী সন্ত্রাসবাদের বিস্তার ঘটায় তার অপগোয়েন্দা তৎপরতার ভিত্তিতে। আর কথিত সন্ত্রাসবাদবিরোধী যুদ্ধের ব্যয়ভার মেটাতে সে এখন পরিণত হয়েছে বিশ্বের সবচেয়ে ঋণগ্রস্ত দেশে। বর্তমানে মার্কিন ঋণের পরিমাণ ১৬ লক্ষ কোটি ডলারে পৌঁছেছে।

প্রধান সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রের এ সাম্প্রতিক বৈশিষ্ট্য পুঁজিবাদের মধ্যকার সাধারণ ভারসাম্য রক্ষার অসম্ভাব্যতাকে নির্দেশ করে। এ ক্রমবর্ধমান সামরিকায়ন ও গণবিরোধী নীতি তাকে এক স্থায়ী অস্থিতিশীলতার দিকে ঠেলে দিচ্ছে। শ্রেণীবৈষম্য ছাড়া যেহেতু পুঁজিবাদ চলতে পারে না, তাই আন্তঃরাষ্ট্রীয় সংঘাত ও বহির্বিশ্বের রাজনীতিক অস্থিরতা উপেক্ষা করা পুঁজিবাদের জন্য অসম্ভব। এ শ্রেণীচরিত্রকে আড়াল করার জন্য শাসক শ্রেণী পুঁজিবাদী সমাজ চিন্তাকে সমাজের গভীরে গ্রোথিত করে তোলে। এভাবে প্রারম্ভিক পর্যায়ে ঐতিহাসিক মার্কসবাদকে সামাজিক সাম্রাজ্যবাদে পর্যবসিত করার চেষ্টা চালানো হয়েছে। তাই শ্রমিক আন্দোলনেও সাম্রাজ্যবাদী মতাদর্শ জোরালোভাবে কার্যকর করে তোলা হয়। এ লক্ষ্যে পুঁজিবাদী তাত্ত্বিকরা কার্যকরী ভূমিকা রাখেন। যেমন, বৃটিশ তাত্ত্বিক বিল ওয়ারেন তাঁর *New Left Review* গ্রন্থে মার্কসবাদের এক ধরনের সাম্রাজ্যবাদী ব্যাখ্যা দাঁড় করান যা ব্রিটেনে শ্রমিক আন্দোলনের তাত্ত্বিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এজন্য বিংশ শতাব্দীর চরমপন্থী বিপ্লবগুলো সমাজতন্ত্রের নামে মার্কসবাদ-লেলিনবাদের ব্যানারে সংঘটিত হলেও এর দ্বি-মুখী ভূমিকা ছিল। একদিকে, এটি উৎপাদিকা শক্তির দ্রুত বিকাশের মাধ্যমে পরিধিভুক্ত পুঁজিবাদ বিকাশের গতি মন্থর করে দেয়। অপরদিকে, এমনকিছু প্রবর্তন করে যাকে সবাই ‘সমাজতন্ত্রের আবির্ভাব’

বলে মনে করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পরিধিভুক্ত দেশগুলোর জাতীয় মুক্তির আন্দোলনে এ নীতিমালা অনুসরণ করা হয়।[৬] মার্কসবাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য যে ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিলুপ্তি সাধন, এ নতুন ধারায় এ দিকটিকে ক্রমশ লঘু করে ফেলা হয়। সম্প্রতি প্রকৃত ইসলামের সাম্যবাদী ও উদারবাদী চরিত্রকে আড়াল করার জন্য সাম্রাজ্যবাদী মদদে ব্যাপকভাবে জঙ্গিবাদী সংগঠন গড়ে তোলা হচ্ছে।

তবে বিপ্লবের নামে এ ধরনের প্রতিবিপ্লবী কার্যক্রম পুঁজিবাদের ইতিহাসে নতুন নয়। লেনিনকেও বিপ্লবের পূর্বে কাউটস্কির অতি-সাম্রাজ্যবাদী তত্ত্বের মোকাবেলা করতে হয়েছিল। মধ্যপন্থার নামে কাউটস্কি এক ধরনের সুবিধাবাদী নীতি গ্রহণ করেছিলেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে জার্মান জাতীয়তাবাদকে অধিক গুরুত্ব দিতে গিয়ে তিনি আন্তর্জাতিকতাবাদের সাম্যবাদ ও শ্রেণী বৈষম্যের দিকটি পুরোপুরি উপেক্ষা করেন। কাউটস্কি সেসময়ে বলেছিলেন, 'প্রত্যেকেরই স্বীয় পিতৃভূমিকে রক্ষা করার দায়িত্ব আছে, সে অধিকার তার আছে। আমার জাতির সঙ্গে যুদ্ধরত জাতিসহ সকল জাতির সমাজতন্ত্রীদের জন্য এই অধিকার স্বীকৃতির বিষয়টি সত্যিকারের আন্তর্জাতিকতাবাদেরই অন্তর্ভুক্ত। লেনিন তাঁর বক্তব্য খণ্ডন করে *দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের পতন* গ্রন্থে লিখেছেন, কাউটস্কির এই কথার মানে দাঁড়াচ্ছে, পিতৃভূমি রক্ষার নামে জার্মান শ্রমজীবীদের ওপর ফরাসী শ্রমজীবীদের গুলি চালানোকে যুক্তিসঙ্গত করে তোলা আর সেটাই হলো সত্যিকারের আন্তর্জাতিকতাবাদ।[৭] যদিও কাউটস্কি তাঁর যুক্তির সমর্থনে মার্কস-এঙ্গেলসের দৃষ্টান্তগুলো উপস্থাপন করেন। কিন্তু সেসময়কার স্বৈরাচারী বা ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে পরিচালিত সেসব লড়াইকে সাম্রাজ্যবাদী প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলার কোনো কারণ নেই বলে লেনিন মনে করতেন। এখানে লেনিনীয় বিশ্লেষণটি অত্যন্ত সুস্পষ্ট। আমরা তাঁর উপর্যুক্ত বিশ্লেষণ থেকে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ আদর্শিক দিক সম্পর্কে অবহিত হই যা বিপ্লবের প্রকৃত বৈশিষ্ট্যকে উন্মোচিত করে। এ বৈশিষ্ট্য তথা আদর্শিক দিকগুলো হচ্ছে: (ক) বিপ্লব সবসময় শোষক শ্রেণীর বিরুদ্ধে শোষিত শ্রেণীর পরিচালিত যুদ্ধ, লড়াই বা আন্দোলন। যে যুদ্ধে এক দেশের শোষিত সমাজ অন্য দেশের শোষিত সমাজের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয় তাকে কখনো বিপ্লবাত্মক কর্মকাণ্ড বা ন্যায় যুদ্ধ বলা যায় না। (খ) ক্ষুদ্র জাতীয় স্বার্থ, সংকীর্ণ স্বার্থান্বেষী দৃষ্টিভঙ্গি বা সাম্রাজ্যবাদী অভিসন্ধি কখনো বিপ্লবের লক্ষ্য হতে পারে না। (গ) আন্তর্জাতিকতাবাদী মানবিকতাবোধই হচ্ছে বিপ্লবের প্রকৃত প্রেরণা। অমানবিক শোষণ থেকে মানবসত্তাকে মুক্ত করাই বিপ্লবের প্রকৃত লক্ষ্যবস্তু। (ঘ) সংখ্যালঘিষ্ঠ শাসক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সংখ্যাগরিষ্ঠ নিপীড়িত জনতার লড়াইকে বিপ্লব বলা চলে। এটি শ্রেণী সংগ্রামের চূড়ান্ত অভিব্যক্তি। তবে এসব লক্ষ্য অর্জনের জন্য কিছু অপরিহার্য শর্তের বাস্তবায়ন একান্ত কাম্য বা বিবেচ্য। এসব

অপরিহার্য শর্ত বিশ্লেষণসাপেক্ষে সাম্প্রতিককালে এর প্রাসঙ্গিকতা যাচাই করে দেখা জরুরী।

বিপ্লবের প্রথম অপরিহার্য শর্ত হলো, শাসক শ্রেণীর জন্য পুরনো পদ্ধতিতে শাসনব্যবস্থা চালিয়ে যাওয়া অত্যন্ত দুরূহ হয়ে পড়বে। এ পরিস্থিতি থেকে এক ধরনের সংকট সৃষ্টি হবে। এ প্রসঙ্গে লেনিন বলেন, একটি জাতীয় সংকট ছাড়া বিপ্লব অসম্ভব।[৮]

সাম্প্রতিককালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসের সবচেয়ে বড় দুটি জাতীয় সংকট 'ফিসক্যাল ক্লিফ' ও 'শাট ডাউন' পরিলক্ষিত হয়। এছাড়াও বেকারত্বের সর্বোচ্চ বৃদ্ধি, ঋণ পরিশোধে জনগণের অক্ষমতা, জনগণের আয় হ্রাস পাওয়া, রাষ্ট্রীয় সেবা খাতগুলো ভেঙ্গে পড়া, মানব উন্নয়নে অবনমন, পেন্টাগনের গোপন দলিলপত্র ফাঁস, সংখ্যালঘু নিপীড়ন প্রভৃতি মার্কিন সমাজে গভীর ক্ষতের সৃষ্টি করেছে। তাছাড়া ২০০৮ সালের মহামন্দা সমগ্র পুঁজিবাদী অর্থনীতির ভিতকে নাড়িয়ে দিয়েছে। স্বয়ং আইএমএফ স্বীকার করেছে, আন্তর্জাতিক মুদ্রাবাজার এখনো নাজুক রয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের মতো ইউরোপেও পুঁজিবাজারে অস্থিরতা এবং স্পেন ও গ্রীসের ঋণসংকট গভীর উদ্বেগজনক পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। এ ঋণসংকট কর্মী ছাঁটাই ও বেকারত্বকে বাড়িয়ে তুলছে। প্রতিমাসেই ইউরো অঞ্চলে লক্ষাধিক যুবক চাকরী হারাচ্ছে। অভ্যন্তরীণ চাহিদায় দুর্বলতার কারণে বেকারত্ব আরও বেড়ে যাবে বলে ইউরোপীয় ইউনিয়ন পূর্বাভাস দিয়েছে। কর্মসংস্থানের অভাব ও বেকারত্ব বৃদ্ধির পাশাপাশি পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাইঅক্সাইডও রেকর্ড পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রকৃতির কার্বন শোষণ ক্ষমতা এখন সর্বোচ্চ সীমায় পৌঁছেছে। এ গ্রীনহাউস প্রতিক্রিয়ায় তাপমাত্রা বাড়ার নেতিবাচক প্রভাবের বড় শিকার হবে দরিদ্র দেশগুলো যা শোষক ও শোষিতের বিভাজনকে আরও স্পষ্ট করে তুলবে। পুঁজিবাদের ভারসাম্যহীন বিধ্বংসী উৎপাদন ব্যবস্থাকে পরিবেশ দূষণ ছাড়াও প্রাকতিক সম্পদের হ্রাসমানতা ও প্রবৃদ্ধির গতি কমে যাওয়ার মতো সংকটকেও মোকাবেলা করতে হচ্ছে।

মূলত প্রযুক্তিগত একচেটিয়াতন্ত্র, বিশ্বব্যাপী আর্থিক বাজারের ওপর নিয়ন্ত্রণ, পৃথিবীর প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর একচেটিয়া কর্তৃত্ব, মিডিয়া ও তথ্য-যোগযোগ এবং গণবিধ্বংসী অস্ত্রের ওপর একচেটিয়া ক্ষমতা—এ পঞ্চবিধ একচেটিয়াতন্ত্রের মাধ্যমে বর্তমান সাম্রাজ্যবাদ এখনও টিকে আছে। এ পাঁচ প্রকারের একচেটিয়াতন্ত্রকে তারা আন্তর্জাতিক আইনের মাধ্যমে নীতিসিদ্ধ করেছে। সামাজিক ও রাজনৈতিক নীতির আঙ্গিকে প্রচারিত হলেও এর প্রতিটি মূলনীতিতে রয়েছে এক ধরনের নিয়ন্ত্রণবাদী অর্থনৈতিক যুক্তিশীলতা। এ ধরনের যুক্তিশীলতা তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর শিল্পায়নের পথে সৃষ্টি করেছে প্রতিবন্ধকতা, অবমূল্যায়ন করা হয়েছে উৎপাদনমুখী শ্রমকে, পণ্যের সঙ্গে একীভূত করে ফেলা হয়েছে মানবীয় শ্রমকে এবং নতুন কেন্দ্রীয় একচেটিয়াতন্ত্রের কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সম্পৃক্ত করে অতিরঞ্জিত কিছু মূল্যবোধ প্রচার করে এসেছে। বর্তমান

একচেটিয়াতন্ত্র অন্য যেকোনো সময়ের তুলনায় সর্বাধিক আয়ের অসমতা সৃষ্টি করেছে।[৯] সারা বিশ্বের ওপর নিজেদের পছন্দমতো নীতিমালা চাপাতে গিয়ে পুঁজিবাদকে একের পর এক সংকট মোকাবেলা করতে হয়েছে। নিত্যনতুন সংকট মোকাবেলা করতে গিয়ে প্রণয়ন করতে হয়েছে নিত্যনতুন কৌশল। বিশ্বায়ন পরবর্তীকালে এ সংকট আরও ঘনীভূত হয়েছে। এ বিষয়টি এখন সর্বজনবিদিত যে, বৈশ্বিক প্রবৃদ্ধির হার ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর ঊর্ধ্বগতি সত্তর থেকে নব্বইয়ের দশকে ক্রমশ হ্রাসের দিকে গিয়েছে। সত্তরের দশকে বৈশ্বিক জিডিপির হার ৫ থেকে ৪.৫ এ নেমে আসে। আশি ও নব্বইয়ের দশকে তা ক্রমান্বয়ে ৩.৪ ও ২.৯ হারে অবনমিত হয়। একবিংশ শতাব্দীতে এসে জি-৭ সরকারগুলো আগামি দিন ভাল হবে বলে যে ঘোষণা নিয়মতান্ত্রিকভাবে দিয়ে যাচ্ছেন তার সঙ্গে বাস্তবতার প্রতিফলন খুব সামান্যই রয়েছে।[১০]

সাম্প্রতিককালে বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত বিপ্লবের যে প্রভাব অর্থনীতির ওপর পড়ছে তা পুঞ্জীভবন প্রক্রিয়াকে এক গভীর সংকটের মুখে পতিত করেছে। উৎপাদিকা শক্তির বিকাশের নামে যে ধ্বংসাত্মক প্রবণতার জন্ম দেয়া হচ্ছে তা পুঁজিবাদী উৎপাদনের যৌক্তিকতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করছে। পুঁজিবাদের স্বল্পমেয়াদী মুনাফার আকাঙ্ক্ষা পূরণে বর্ষণ বনকে উজাড় করে দেয়া হয়েছে। তৃতীয় বিশ্বের পরিবেশের ওপর পুঁজিবাদের এ আগ্রাসী আক্রমণকে পরিবেশবাদীরা নব্য-ঔপনিবেশিকতার নতুন রূপ হিসেবে বিবেচনা করেছেন। এভাবে পুঁজিবাদ বননিধনের মতো গচ্ছিত খনিজ নিঃশেষ, মাটির উপরিভাগ ধ্বংস বা নদী দূষণের মাধ্যমে যে আগ্রাসী উৎপাদন ব্যবস্থা গ্রহণ করে বায়ুমণ্ডলের স্বাভাবিক গঠনের বিনাশ সাধন, বৈশ্বিক উষ্ণায়ন বৃদ্ধি ও সমুদ্রস্তরের উচ্চতা বৃদ্ধিসহ নানাবিধ সংকট সৃষ্টি করছে যা আজকের দিনের সবুজ আন্দোলনের ভিত্তিপ্রস্তর নির্মাণ করেছে। শিল্পায়ন মানেই জ্বালানির ব্যবহার। এ মরণঘাতী উৎপাদন পদ্ধতি সমগ্র মানবজাতি, প্রকৃতি ও জীবজগতের অস্তিত্বের পক্ষে এক ধরনের স্ববিরোধিতায় লিপ্ত। তাছাড়া শিল্পোন্নত দেশগুলোর বিপুল মারণাস্ত্র সমগ্র জীবের মৃত্যু ঘটাতে সক্ষম। তাই এ যুগের সাম্রাজ্যবাদী প্রযুক্তিগত একচেটিয়াতন্ত্র মানুষের বেঁচে থাকার সব কয়টি উপকরণে মারাত্মক হুমকি সৃষ্টি করেছে।

প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ সামির আমিন[*১১] সাম্প্রতিক পুঁজিবাদের এ নেতিবাচক চরিত্রগুলো বিশ্লেষণ করে এর ভেতরকার দ্বিবিধ অসঙ্গতি তুলে ধরেছেন। এ অসঙ্গতিদ্বয়

---

* সামির আমিন ১৯৩১ সালে মিশরে জন্মগ্রহণ করেন এবং প্যারিসে রাজনীতি, পরিসংখ্যান ও অর্থনীতির ওপর উচ্চতর ডিগ্রি লাভ করেন। পুঁজিবাদের পরিবর্তিত চরিত্র, উত্তর-দক্ষিণ সম্পর্ক ও উন্নয়ন তত্ত্ব সম্পর্কে সম্প্রতি উদ্ভূত প্রশ্নগুলোর সমাধানে তিনি এ সময়ের একজন মৌলিক চিন্তাবিদ, যিনি বিশ্বব্যাপী সুখ্যাতি অর্জন করেছেন। ১৯৭০-৮০ সাল পর্যন্ত তিনি IDEP (the United Nations African Institute for Planning) এর

পুঁজিবাদকে একটি সেকেলে ব্যবস্থাপনায় পর্যবসিত করতে যাচ্ছে। পুঁজিবাদের সেকেলে প্রতিপন্ন হওয়ার প্রথম কারণ হলো, বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত বিপ্লবের দীর্ঘমেয়াদী ফলাফল যেমন, পুঁজিবাদ যে কম্পিউটার-প্রযুক্তি ও মানুষের শ্রম লাঘবের জন্য উদ্ভাবিত পদ্ধতি ও যন্ত্রপাতিকে প্রবর্তিত করছে তাতে স্বল্প শ্রমে ও পুঁজিতে বৃহৎ বস্তুগত অর্জন সম্ভব হচ্ছে। এতে পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থার মূল ঐতিহাসিক উদ্দেশ্যটি ব্যাহত হচ্ছে। পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থার মূল ভিত্তি হচ্ছে পুঁজির মাধ্যমে শ্রমের ওপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠা। এখানে আধিপত্যের মাত্রাটি স্বল্প। অন্য কথায়,পুঁজিবাদী সামাজিক সম্পর্ক এখন আর আগের মতো ধারাবাহিক পুঞ্জীভবনকে অনুসরণ করতে দিচ্ছে না। কারণ এখন তা মানব সভ্যতার উৎকর্ষের পথে বাধা সৃষ্টি করছে। এজন্য পুঁজির ব্যক্তিগত মালিকানার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত সামাজিক সম্পর্কের অবলুপ্তি এখন একটি বস্তুনিষ্ঠ প্রয়োজন। বস্তুগত সম্পদের নবতর প্রবৃদ্ধির এ যুগে পুঁজিবাদী অনিবার্যতা প্রকাশ পায়নি। বর্তমানে পুঁজিবাদী দেশগুলোতে পেশীশক্তি দিয়ে চালিত শ্রমিক শ্রেণীর পরিবর্তে এক নতুন কর্মজীবী শ্রেণী উৎপাদনের প্রধান চালিকাশক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। পণ্ডিতরা তাদের নাম দিয়েছেন 'নলেজ ওয়ার্কার্স' বা 'জ্ঞানশ্রমিক'। উৎপাদনমুখী বাণিজ্যের চেয়ে যুক্তরাষ্ট্রে এখন আর্থিক বাজারের প্রাধান্য বেশি। তাই নতুন এ শ্রমজীবী সম্প্রদায়ের আবির্ভাব। ইউরোপজুড়েও যখন বেকারত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে, তখন এ আধুনিক জ্ঞান শ্রমিকরাই আন্দোলন গড়ে তুলছে। তাই আজকের দিনে লেনিনীয় বিপ্লব তত্ত্বের তুলনায় মার্কসীয় বিপ্লব তত্ত্বই অধিক কার্যকর হয়ে উঠেছে। তিনি শিল্পোন্নত সমাজে বিপ্লবের অধিক কার্যকারিতার কথা বলেছিলেন।

সুতরাং, আজকের সাম্রাজ্যবাদ প্রযুক্তিগত বিপ্লবের দ্বি-মুখী শিকারে পরিণত হয়েছে। একদিকে, পুঁজিবাদ অধিক মুনাফার আশায় তার উৎপাদনমুখী কল-কারখানা তৃতীয় বিশ্বে সরিয়ে নিচ্ছে। ফলে তাদের অধিক কার্বন নি:সরণের ফলভোগ করছে তৃতীয় বিশ্বের পরিবেশ। অন্যদিকে, কোনো দেশের বাজার জোরপূর্বক দখলের জন্য পুঁজিবাদ আশ্রয় নিচ্ছে গণবিধ্বংসী যুদ্ধের, এখানেও মানুষ ও পরিবেশকে দিতে হচ্ছে চরম মূল্য। তাই তৃতীয় বিশ্বের মানুষ তাদের অস্তিত্বের সংকট মোকবেলায়

পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন, এছাড়া তিনি ডাকার ও সেনেগালে *তৃতীয় বিশ্ব ফোরামের* পরিচালক ছিলেন। তিনি *World Forum for Alternatives* এর অন্যতম প্রবক্তা। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলো হচ্ছেঃ *The Arab Nation: Nationalism and Class Struggle* (1978), *The Arab Economy Today* (1982), *Maldevelopment: Anatomy of Global Failure* (1990), *Eurocentrism* (1989), *Delinking: Toward a Polycentric World* (1990), *The Empire of Chaos* (1992), *Re-reading the Postwar Period: An Intellectual Itinerary* (1994), *Capitalism in the Age of Globalization: The Management of Contemporary Society* (1997), *Obsolescent Capitalism* (2003) প্রভৃতি।

সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে গড়ে তুলছে পরিবেশবাদী ও যুদ্ধবিরোধী আন্দোলন। অপরদিকে, নিজ দেশে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে দ্রুত বিকাশমান জ্ঞানশ্রমিকরা গড়ে তুলছে সাম্যবাদী ও সমতাবাদী আন্দোলন যার চূড়ান্ত রূপ ছিল 'অকুপাই ওয়ালস্ট্রীট' বিক্ষোভ। সাম্প্রতিককালে শ্রেণী সংগ্রামের আরও একটি আকর্ষণীয় দিক হচ্ছে মার্কিন রাজনীতিতে সরাসরি শ্রেণীযুদ্ধ শব্দটি ব্যবহৃত হওয়া। ১ শতাংশ মানুষের সীমাহীন লোভের কারণে আমেরিকায় অর্থনৈতিক মন্দাবস্থা সৃষ্টি হয়। আর্থিক ব্যবস্থাপনা সংকটের মুখে পড়েছে, দেউলিয়া হয়েছে সাধারণ মানুষ, বেকারত্বে ভুগছে প্রতি ১০০ জনে ৮ জন মানুষ। অথচ, দেশের করনীতি এ এক শতাংশ মানুষের অনুকূলে। তাই স্বয়ং প্রেসিডেন্ট ওবামা বলেছেন,গত ২০ বছরে আমেরিকার অর্থনৈতিক অব্যবস্থার জন্য সবচেয়ে লাভবান হয়েছে দেশের মাত্র ২ শতাংশ মানুষ। এখন সময় এসেছে তাদের আনুপাতিক কিছু দায়িত্ব নেয়ার। ওবামার এ ঘোষণাকে রিপাবলিকানরা সরাসরি 'শ্রেণীযুদ্ধ' বলে অভিহিত করে। একইভাবে, ওয়ালস্ট্রীটের লাগামহীন ব্যবহারের প্রতিবাদে যে 'অকুপাই ওয়ালস্ট্রীট আন্দোলন' গড়ে ওঠে তাকে রিপাবলিকানরা 'শ্রেণীযুদ্ধ' বলে মন্তব্য করে। অপরদিকে, রক্ষণশীল নীতির প্রবর্তক রোনাল্ড রিগ্যান যে 'চুঁইয়ে পড়া অর্থনীতির'* প্রচলন করেন, তাকে ডেমোক্র্যাটরা 'গরীব ও মধ্যবিত্তের বিরুদ্ধে শ্রেণীযুদ্ধ' বলে অবহিত করে। বিপরীতক্রমে, ওবামা কর্তৃক ছাত্রদের সহজ শর্তে শিক্ষা ঋণের ব্যবস্থা, অবৈধ অভিবাসীদের শিক্ষার আইনসঙ্গত পদক্ষেপ, অর্থনৈতিক মন্দাবস্থার কারণে বেকার ভাতার সময়সীমা বৃদ্ধি, দরিদ্রদের স্বাস্থ্যবীমার ব্যবস্থা নিশ্চিত করে আইন প্রণয়ন প্রভৃতি কর্মসূচিকে মিট রমনি 'গরীবদের জন্য ওবামার উপহার' বলে ব্যঙ্গ করেছেন।[১২] ক্ষয়িষ্ণু পর্বে এসে লেনিন সাম্রাজ্যবাদের সবচেয়ে বেশি দমনমূলক ও শোষণমূলক হয়ে ওঠার যে ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন এ যেন তারই অভিব্যক্তি বহন করে।

পুঁজিবাদের 'সেকেলে' হয়ে ওঠার সপক্ষে আমিন যে দ্বিতীয় কারণটি নির্দেশ করেন তা হচ্ছে, যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপ, জাপানের সমষ্টিগত ত্রয়ী সাম্রাজ্যবাদের দিকনির্দেশনা

---

* মুক্ত বাজার অর্থনীতির প্রবক্তারা যুক্তি দেখান যে, বড় বড় কর্পোরেশনগুলোর হাতে যত বেশি সম্পদ জড়ো হবে, ততই সেই সম্পদের কিছু কিছু চুঁইয়ে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছবে। তাই অর্থনীতির এই ধারাকে 'ঘোড়া দিয়ে চড়ুই পাখিকে খাওয়ানো' হিসেবেও অভিহিত করা হয় অর্থাৎ হজম করতে না পারায় ঘোড়ার গোবরে যেসব শস্যদানা থাকে তা যেভাবে চড়ুই পাখি খুঁটে খায়, সেভাবে ধনীদের উচ্ছিষ্ট পৌঁছবে গরীবের পেটে। এ সম্পর্কে উপহাস করে বলা হয়, ধনীদের তেলে মাথায় আরও বেশি তেল ঢাললে সে মাথা থেকে চুঁইয়ে বাড়তি যে দু-চার ফোঁটা তেল গড়িয়ে পড়বে, নিচের তলার মানুষের তা নিয়েই খুশি থাকতে হবে। অর্থাৎ, ধনী যদি আরও ধনী হয়, তাহলে তার মাথা থেকে চুঁইয়ে পড়া তেলের পরিমাণ বাড়বে।

মোতাবেক পরিধিভুক্ত দেশগুলোতে 'নির্ভরশীল' পুঁজিবাদী বিকাশ কার্যকর রাখা কঠিন হয়ে পড়েছে। বৈশ্বিক পুঁজিবাদের ঐতিহাসিক পর্বগুলোতে কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রগুলো পরিধিভুক্ত দেশগুলোতে পুঁজি রপ্তানিতে অত্যন্ত সক্রিয় ভূমিকা পালন করতো। এ নির্ভরশীলতার ভিত্তিতে এক ধরনের অসম উন্নয়ন টিকিয়ে রাখা সম্ভব হতো। সুতরাং, পুঁজি রপ্তানিই ছিল পরিধিগুলোর এ উদ্বৃত্ত শ্রম শোষণ করে উদ্বৃত্ত মূল্য অর্জনের প্রধান হাতিয়ার। অর্থাৎ, পুঁজির উদ্বৃত্ত নির্গমনের তুলনায় মুনাফা ফিরিয়ে আনাই ছিল তখন পুঁজি রপ্তানির প্রধান কৌশল। সাম্রাজ্যবাদের প্রধান কেন্দ্র যুক্তরাষ্ট্র এ কাজে এখন আর সঠিকভাবে নেতৃত্বের দায়িত্ব পালন করছে না। সে নিজে সারা বিশ্ব থেকে বিপুল অঙ্কের উদ্বৃত্ত মূল্য শোষণ করলেও তার সহযোগী সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলো পরিধিভুক্ত দেশগুলোতে আর বেশিদিন পুঁজি রপ্তানিকারী হিসেবে ভূমিকা রাখতে পারছে না। নতুন উৎপাদনমুখী বিনিয়োগের সুযোগ না থাকায় উন্নয়নশীল দেশগুলো থেকে সুদে-আসলে ঋণ আদায়ের মতো নানা কৌশল অবলম্বন করে তারা এখন উদ্বৃত্ত মূল্য আদায় করে নেয়। আমিন মনে করেন, সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থার এ পরাশ্রয়ী চরিত্র তাকে 'সেকেলে' প্রতিপন্ন করে এবং কেন্দ্র ও পরিধির দ্বন্দ্বকে আসন্ন করে তোলে।

এ দ্বিবিধ অকার্যকারিতার উপাদান পুঁজিবাদকে এক 'সৃষ্টিহীন ধ্বংসে'র দিকে ঠেলে দেবে বলে আমিনের বিশ্বাস। শুমপিটার যেখানে 'সৃজনশীল ধ্বংসে'র কথা বলেছিলেন, আমিনের অবস্থান পুরোপুরি তার বিপরীতমুখী। যদিও প্রচলিত ধারার গণমাধ্যমে অহরহই প্রচারিত হচ্ছে যে, পরিধিগুলো থেকে কেন্দ্র ক্রমশ সরে আসছে। এ থেকেই প্রমাণিত হয়, এখন সাম্রাজ্যবাদ বলে কিছু নেই। সুতরাং, দক্ষিণকে ছাড়াই উত্তর ভালো চলছে। এ ধরনের চিন্তা-ভাবনার প্রভাব নেগ্রি ও হার্টের *Empire* গ্রন্থে রয়েছে। কিন্তু আইএমএফ, ডব্লিউটিও ও ন্যাটোর অপতৎপরতা প্রতি মুহূর্তে এ ধরনের ভাবধারার অসারতা প্রমাণ করছে। নেগ্রি-হার্টের ধারণা ঔপনিবেশিক যুগে যেমন জাতি-রাষ্ট্রের প্রভুত্ব ছিল তা এখন আর নেই। কোনো জাতির পক্ষে আর বিশ্বনেতা হওয়া সম্ভব নয়। অথচ ঔপনিবেশিক যুগের অবসানের পর আমরা দেখেছি, একক বিশ্বনেতা হিসেবে যুক্তরাষ্ট্র অন্যান্য জাতির ওপর এত বেশি প্রভুত্ব বিস্তার করেছে যে, বিভিন্ন সময়ে তার সহযোগী সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলোও ক্ষুব্ধ হয়েছে। আন্তর্জাতিক অর্থব্যবস্থায় যুক্তরাষ্ট্রের সুযোগ-সুবিধার প্রতি ইউরোপীয় দেশগুলো ও জাপান বিভিন্ন সময়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেছে। আজও ডব্লিউটিওর সিদ্ধান্ত গ্রহণে যুক্তরাষ্ট্রের একক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। এছাড়া বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফের ওপর একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণের কারণে যুক্তরাষ্ট্র বিশ্ব অর্থনীতিতে নিজের আধিপত্য অক্ষুণ্ন রেখেছে। কিন্তু তার এ প্রভুত্ব অন্য শক্তিগুলোকে ক্ষুব্ধ করে তুলেছে।

সাম্রাজ্যবাদের এ দ্বন্দ্বকে আড়াল করতে গিয়ে নেগ্রি ও হার্ট বলেন, আমরা এখন উত্তর-সাম্রাজ্যবাদী পর্বে উপনীত হয়েছি। সাম্রাজ্যবাদ এখন সাম্রাজ্যে রূপান্তরিত

হয়েছে। এই সাম্রাজ্যের শাসনের কোনো সীমা নেই। সাম্রাজ্যের ব্যবহারিক অনুশীলন বার বার রক্তস্নাত হলেও তার প্রথম ও প্রধান কাজ শান্তিরক্ষা।[১৩] অর্থাৎ, শান্তিরক্ষার জন্য সাম্রাজ্যকে প্রয়োজনে পুলিশি দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। এজন্য হার্ট-নেগ্রি মার্কিন সাম্রাজ্যকে গণতান্ত্রিক মনে করেছেন। সুতরাং, আরেক রাষ্ট্রের ওপর সার্বভৌমত্বের প্রয়োগ এখন আর সাম্রাজ্যের উদ্দেশ্য নয়। এখানে মার্কিন রাষ্ট্রের দ্বৈত চরিত্রটি নেগ্রি-হার্ট আড়াল করার চেষ্টা করেছেন। যুক্তরাষ্ট্র নানা মিথ্যা অজুহাত দেখিয়ে সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ হাসিলের জন্য যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। সে সামরিক খাতে যে বিপুল অঙ্কের অর্থ ব্যয় করে তা অন্যান্য শক্তিগুলোর সম্মিলিত সামরিক ব্যয়ের চেয়েও কয়েক গুণ বেশি। ১৮৯০-২০০৩ বিগত এই ১১৩ বছরে আমেরিকা মোট ১৩০ বার অন্য দেশে আগ্রাসন চালিয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ থেকে ইরাক যুদ্ধ পর্যন্ত ৫৮ বছরে সে ৬৫ বার অন্য দেশে সামরিক হস্তক্ষেপ করেছে। এই 'অনন্ত যুদ্ধ' আজকের মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সংকট থেকে মুক্তির উপায়। কারণ বিশ্বায়ন ও বাজার অর্থনীতি সংকটগ্রস্ত সাম্রাজ্যবাদকে সংকটমুক্ত করবে একথা মার্কিন পুঁজিপতিরাও বিশ্বাস করে না। তাই মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ সারা বিশ্ব লুণ্ঠন করে এবং নব্য-ঔপনিবেশিক কৌশলে শোষণ চালিয়েও অর্থনৈতিক সংকট থেকে মুক্ত থাকতে পারছে না। ফলে আশু সমাধানের লক্ষ্যে তাকে আগ্রাসন, অস্ত্রবিক্রি, ষড়যন্ত্র, পরোক্ষ সামরিক হস্তক্ষেপ, এমনকি যুদ্ধের আশ্রয় নিতে হচ্ছে। একারণে ১৯ ও ২০ শতকে ব্রিটিশ, ফরাসি, স্পেনীয় বা ওলন্দাজ ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে দীর্ঘ সংগ্রাম করে যেসব দেশ ও রাষ্ট্র স্বাধীনতা লাভ করেছিল তাদের আজ ব্যর্থ রাষ্ট্রের তালিকাভুক্ত করে বুশ ডকট্রিন প্রি-এমপটিভ আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু করেছে। যুদ্ধ-আক্রমণ-লুণ্ঠন চালিয়ে ঐসব দেশ ও রাষ্ট্রে মার্কিনি অর্থনীতি-রাজনীতি-সংস্কৃতি চাপিয়ে দিয়ে মার্কিনীকরণের চেষ্টা শুরু হয়েছে। 'ব্যর্থ রাষ্ট্রে'র তালিকার অগ্রভাগে রয়েছে ইরাক, ইরান, সিরিয়া, লেবানন ইত্যাদি। ভারত, পাকিস্তান, ইন্দোচীনের দেশগুলোও তালিকার অন্তর্ভুক্ত।[১৪] সুতরাং, আজকের সাম্রাজ্যবাদের এ ধ্বংসাত্মক নীতিই তাকে নেগ্রি-হার্টের শান্তিপ্রয়াসী সাম্রাজ্যের ধারণাকে অপ্রমাণ করে আমিনের 'সৃষ্টিহীন ধ্বংসে'র ধারণাটিকে অনিবার্য করে তোলে। শুমপিটারের 'সৃজনশীল ধ্বংসে'র ধারণাটি বর্তমান বাস্তবতায় নিতান্তই অলীক।

বিপ্লবের দ্বিতীয় শর্ত হলো শোষিত শ্রেণীর দারিদ্র ও দুর্ভোগ চরম পর্যায়ে পৌঁছনো।[১৫] চরম দারিদ্র নতুন কিছু না হলেও বৈশ্বিক অসমতার বিস্তৃতি ঘটা নতুন একটি বিষয়। এর ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটেছে নব্য-উদারবাদী বিশ্বায়ন ও গ্যাটের বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে। উচ্চ আয়ের দেশগুলো যারা বিশ্ব জনসংখ্যার মাত্র ১৫.৬ শতাংশ, তারা বৈশ্বিক আয়ের ৮১ শতাংশ ভোগ করে। তাদের বার্ষিক মাথাপিছু আয় ২৬,৭১০ ডলার। অপরদিকে, সারা বিশ্বের অন্য সব দেশের মানুষের বার্ষিক মাথাপিছু আয় ৫,১৪০ ডলার।[১৬] দিন দিন এ বৈষম্য আরও বেড়েই চলেছে। ভারসাম্যহীন

বিশ্বায়ন প্রক্রিয়া একদিকে যেমন বৈশ্বিক অসমতা সৃষ্টি করে উত্তর-দক্ষিণের সংঘাতকে অবধারিত করে তুলছে, অপরদিকে, উত্তরের অভ্যন্তরীণ সংঘাতকেও রুখতে পারছে না। বর্তমানে মন্দার প্রভাবে উত্তরের দেশগুলোতে বেকারত্ব, ছাঁটাই, লে-অফ, ক্লোজার বেড়েই চলেছে। একদিকে ব্যাপক কর্মহীনতা ও অন্যদিকে কর্পোরেট জগতে ব্যাপক দুর্নীতি— এর ফলে যুক্তরাষ্ট্রে একজন সাধারণ শ্রমিক ও একজন কর্পোরেট সি.ই.ও-র মধ্যে আয়ের অনুপাত দাঁড়িয়েছে ১ঃ১২৫০।[১৭] সম্প্রতি বিকাশমান এ অসমতা দেশে বিদেশে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে গণঅসন্তোষকে বাড়িয়ে দিচ্ছে।

অথচ, একটি সত্যিকার সভ্য সমাজের প্রধান বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে সমতার দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে মানবিকতার পূর্ণ বিকাশ সাধন এবং মানুষ হিসেবে মানুষের মর্যাদার অনুভূতিকে জাগ্রত করা। অপরদিকে, অসমতা সমাজকে অমানবিক ও অমর্যাদাকর অবস্থায় পর্যবসিত করে। এ প্রসঙ্গে ইংরেজ কবি ম্যাথিউ আর্নল্ড মন্তব্য করেন, অসমতা একদিকে প্রশ্রয় দানের মাধ্যমে ক্ষতি করে, অন্যদিকে এটি স্থূল এবং কষ্টদায়ক। এটি এমন একটি প্রক্রিয়া যা প্রকৃতিবিরুদ্ধ বলে প্রতীয়মান হয়। এবং দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে এটি ভেঙ্গে পড়ে।[১৮] এখানে তিনি বলতে চেয়েছেন, অসমতা শুধু একটি শ্রেণীকে অতিরিক্ত প্রশ্রয় দানেই সীমিত নয়, অপর একটি শ্রেণীর জন্য সীমাহীন দুর্ভোগ সৃষ্টিতেও তৎপর। এভাবে অসমতা শোষক ও শোষিত শ্রেণীর ব্যবধান বাড়িয়ে সমাজজীবনে ভারসাম্যহীনতা সৃষ্টি করে। এই ভারসাম্যহীনতার পরিণতিতে ভাঙ্গন একসময় অত্যাসন্ন হয়ে ওঠে। তাই এ সামাজিক অসমতার অনিবার্য পরিণতি হচ্ছে বিপ্লব। সামাজিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে প্রতিষ্ঠান পরিবর্তিত হতে ব্যর্থ হলে একটি সাময়িক অচলাবস্থা সৃষ্টি হয় এবং একটি বিপ্লবের পথ প্রশস্ত হয়।

এই একবিংশ শতাব্দীতে মার্কিন সমাজে বর্ণবাদ অত্যন্ত নগ্নভাবে প্রকাশিত হয়েছে। এফবিআইয়ের তথ্য মতে, ২০০৫ থেকে ২০১২ সাল পর্যন্ত সাত বছরে প্রতি সপ্তাহে গড়ে প্রায় দুটি এমন ঘটনা ঘটেছে, যেখানে একজন শ্বেতাঙ্গ পুলিশ একজন কৃষ্ণাঙ্গকে গুলি করে হত্যা করেছে। এভাবে গত এক দশকে যুক্তরাষ্ট্রে পুলিশি নির্যাতন আশঙ্কাজনকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সংখ্যালঘু নাগরিকরাই পুলিশি নির্যাতনের শিকার হন। তাই সেদেশের কৃষ্ণাঙ্গ নাগরিকদের একটি বড় অংশই মনে করে, শুধু আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীই নয়, বিচারব্যবস্থা, বিশেষত গ্র্যান্ড জুরি ব্যবস্থা, তাদের জীবন ও অধিকার সুরক্ষা করতে পারছে না।[১৯] সম্প্রতি শ্বেতাঙ্গ পুলিশ নিউ ইয়র্কে কৃষ্ণাঙ্গ ব্যক্তিকে শ্বাসরোধ করে হত্যা এবং ফার্গুসনে ১৮ বছর বয়সী কৃষ্ণাঙ্গ কিশোরকে গুলি করে হত্যা করলেও গ্র্যান্ড জুরি দুটি ক্ষেত্রেই পুলিশ কর্মকর্তাকে অভিযুক্ত করতে অস্বীকৃতি জানায়। যুক্তরাষ্ট্রে পুলিশ বাহিনীর মতোই অবাধে প্রশ্রয় পাচ্ছে সেদেশের গোয়েন্দা সংস্থাগুলোও। সম্প্রতি সিআইএর নিষ্ঠুর নির্যাতনের প্রতিবেদন প্রকাশিত হলে জানা যায়, বন্দীকে কষ্টকর ভঙ্গিতে দীর্ঘসময় বসিয়ে রাখা,

পোকা-মাকড়ের মধ্যে রাখা, ঘুষি মারা, প্রহার করা, ওয়াটার বোর্ডিং, ২৬৬ ঘণ্টা কফিনের ভেতর রাখা, নগ্ন করে রাখা, টানা সাত দিন ঘুমাতে না দেয়া, মলদ্বার দিয়ে নল ঢুকিয়ে খাওয়ানোর মতো অমানবিক ও অনৈতিক পদ্ধতিতে নির্যাতন করা হয়েছে। এ নিষ্ঠুর নির্যাতনের তথ্য ছড়িয়ে পড়লে বিশ্বময় সিআইএর বিচারের দাবি উঠলেও সাবেক ভাইস প্রেসিডেন্ট ডিক চেনি এই নির্যাতকদের 'বীর' বলে আখ্যায়িত করেন এবং তাদের রাষ্ট্রীয় পদক দিয়ে সম্মানিত করার দাবি জানান। উচ্চ পর্যায় থেকে এ নির্যাতনের নির্দেশ এসেছিল বলে মন্তব্য করেন জাতিসংঘের মানবাধিকার ও সন্ত্রাসবাদ বিষয়ক বিশেষ দূত।

এ উচ্চমহলটি দীর্ঘকাল যাবৎ আইনের ঊর্ধ্বে থেকে দেশে-বিদেশে বিপুল সংখ্যক মানুষের সীমহীন দুর্ভোগের কারণ হচ্ছে। বিদ্যমান ব্যবস্থার ত্রুটি, আইনের শাসন ও সুশাসনের অভাবই এ কষ্টদায়ক পরিণতির জন্য দায়ী। এজন্যই অস্তিত্ববাদী দার্শনিক জাঁ পল সাঁত্রে সকল সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোর ঊর্ধ্বে মানুষের স্বাধীনতাকে সর্বাগ্রে স্থান দিয়েছিলেন। এ অধিকার হননের বিরুদ্ধেই সমকালীন আন্দোলনগুলো সংঘটিত হচ্ছে। আজকের দিনের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কৃষ্ণাঙ্গদের নাগরিক অধিকার অর্জনের আন্দোলন, শিক্ষাপদ্ধতি পরিবর্তনের দাবিতে ফ্রান্সের ছাত্র বিক্ষোভ, শিক্ষাব্যবস্থার বাণিজ্যিকরণের বিরুদ্ধে ব্রিটেনের ছাত্রসংগ্রাম, রাষ্ট্রব্যবস্থার গণতন্ত্রায়নের দাবিতে স্পেনের শ্রমিক বিদ্রোহ, ইউরোপজুড়ে বেকার যুবকদের বিক্ষোভ, 'অকুপাই ওয়ালস্ট্রীট' আন্দোলন পুঁজিবাদী রাষ্ট্রযন্ত্রের অন্তর্নিহিত ত্রুটির প্রতিই অঙ্গুলি নির্দেশ করে। বিদ্যমান রাষ্ট্রকাঠামোর অন্তর্গত বিচারব্যবস্থা, সামরিক বাহিনী ও জনপ্রশাসনে নিয়োজিত আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীগুলোর অপতৎপরতা প্রচলিত ব্যবস্থার ভারসাম্যহীনতাকে প্রকাশ করে। তাই এ সময়ের তারুণ্যদীপ্ত নাগরিক অধিকার আন্দোলনগুলোকে নিশ্চিতভাবেই শ্রেণীযুদ্ধ বলা যায়। এ ধরনের আন্দোলনের নেতৃত্বে আজকাল আর কোনো রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বকে দেখা যায় না। বরং কবি, লেখক, বুদ্ধিজীবীরাই এসব আন্দোলনের অগ্রনায়ক থাকেন। মানুষের অধিকার আদায়ের এ লড়াইগুলোতে শিল্পায়িত সমাজের অন্তর্নিহিত ত্রুটিগুলো থেকে পরিত্রাণের পথ খোঁজা হয়।

শিল্পায়িত সমাজের শোষণমূলক চরিত্রের কারণেই আজ মানুষের স্বাভাবিক জীবন ব্যাহত হচ্ছে, তারা কাজ হারাচ্ছে, নিজস্ব চাহিদা পরিপূরণে ও সম্ভাবনার বিকাশ সাধনে ব্যর্থ হচ্ছে এবং কর্মক্ষেত্রে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি হচ্ছে। নব্য-বামপন্থী চিন্তাবিদ মার্কাস দেখান, *Capital* গ্রন্থে মার্কস যে কর্ম পরিবেশের বর্ণনা করেছেন তা এখন অনেকাংশেই বদলে গেছে। অন্য যেকোনো সময়ের তুলনায় এখন মানুষের বৌদ্ধিক ও বস্তুগত জীবনের ওপর সমাজের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু মার্কস বর্ণিত পরস্পরবিরোধী বুর্জোয়া ও প্রলেতারিয়েত শ্রেণী এখনও আধুনিক পুঁজিবাদের মৌলিক

শ্রেণী হিসেবে বিরাজ করছে। মার্কাস মনে করেন, পুঁজিবাদের বিকাশ তার কাঠামো ও দুই শ্রেণীর ক্রিয়া-কলাপে পরিবর্তন আনলেও ঐতিহাসিক রূপান্তরে তাদের ভূমিকা আগের মতোই আছে। বরং অবস্থার উত্তরণ ও আগ্রহ-উদ্দীপনা বৃদ্ধির কারণে সমকালীন সমাজের সবচেয়ে অগ্রসর ক্ষেত্রগুলোতে তারা ঐক্যবদ্ধভাবে পুরাতন সংঘাতে অবতীর্ণ হয়। মার্কাস বলেন, আজকের একপাক্ষিক মানুষ এখন দুটো স্ববিরোধী প্রকল্পের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হবে। যথাঃ (১) অগ্রসর শিল্পায়িত সমাজ তার আসন্ন ভবিষ্যতের জন্য যেকোনো পরিমাণগত পরিবর্তন আনয়নে সক্ষম।(২) বিরাজমান শক্তি ও প্রবণতা এই আধেয় বা কাঠামোকে ভেঙ্গে দেবে এবং সমাজকে বদলে দেবে।[২০]

আজকের যুগের পুঁজিবাদের কেন্দ্রে ফাটকামূলক প্রবণতা ঊর্ধ্বগতিতে বেড়ে চলায় উৎপাদনমুখী কর্মকাণ্ডের তুলনায় আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর দাপট ও স্বেচ্ছাচারিতাও বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। ফাটকা পুঁজির এ লাগামহীন ক্রিয়া মার্কিন পুঁজিবাদকে পরিণত করেছে এক ‘দুর্বৃত্তায়িত’ পুঁজিবাদে। ৯০-এর দশক ছিল লগ্নি পুঁজির ইতিহাসে সবচেয়ে দীর্ঘস্থায়ী ও সর্বব্যাপী ফাটকা পুঁজির দশক। এ ক্যাসিনো পুঁজির হাত ধরে গত এক দশকে মার্কিন পুঁজিবাদেরও দুর্বৃত্তায়ন ঘটেছে। এই দুর্বৃত্তায়নের পেছনেও রয়েছে সেই উচ্চমহলের শোষক শ্রেণী মার্কিন কর্পোরেট ও রাজনৈতিক অলিগর্কিরা। এসময়ে এনরন ও ওয়ার্ল্ডকমের মতো দৈত্যাকার বহুজাতিকগুলো গ্রাস করেছে বড় বড় ব্যাংক, হিসাব পরীক্ষা সংস্থা, জনসংযোগ ও বিজ্ঞাপন তথা আইনি পরামর্শদাতা সংস্থা ইত্যাদিকে। ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্পের সাথে সঙ্গতিহীনভাবে পরিষেবা ক্ষেত্রটির তুলনামূলক অস্বাভাবিক বৃদ্ধি আজকের ক্যাসিনো অর্থনীতির ভিত্তি হিসেবে কাজ করছে। মার্কস বলেছিলেন, সঙ্কটই পুঁজিবাদকে আগ্রাসী করে তোলে। আর সব সঙ্কটের মূলে কাজ করে অর্থনৈতিক সংকট। দীর্ঘ মন্দার কারণে যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধ অর্থনীতিকে বেছে নেয়। যুদ্ধের মাধ্যমে কৃত্রিমভাবে অর্থনীতিকে চাঙ্গা করে তুলতে চায়। নিজেদের এই আর্থিক যথেচ্ছাচারের অর্থ যোগানোর জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এখন বিদেশী পুঁজি আমদানির ওপরও নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। অর্থনীতির এ সমস্ত ভারসাম্যহীনতা মোকাবেলা করতে গিয়ে তাকে আগ্রাসন, অস্ত্র বিক্রি, ষড়যন্ত্র, পরোক্ষ সামরিক হস্তক্ষেপ এমনকি যুদ্ধের আশ্রয় নিতে হচ্ছে।[২১] এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, তাদের ব্যাপক প্রশ্রয় দান আজকের পুঁজিবাদকে ক্ষয়িষ্ণু ও ভঙ্গুর অবস্থায় পর্যবসিত করেছে। এই দুই শতাংশ ধনিক গোষ্ঠী মার্কস বর্ণিত ‘বুর্জোয়া’ শ্রেণীর আর ৯৮ শতাংশ জনগণ ‘প্রলেতারিয়েত’ শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব করছে। তাই মার্কাসের বিশ্লেষণে গুণগত পরিবর্তন বা বিপ্লবের যে শর্ত নির্দেশিত হয়েছে সাম্প্রতিক পুঁজিবাদের ভগ্নদশা তাকে অত্যন্ত যুক্তিসিদ্ধ করে তুলেছে।

ক্ষয়িষ্ণু পর্বে এসে সাম্রাজ্যবাদ সর্বোচ্চ প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে উঠবে এবং যুদ্ধই সাম্রাজ্যবাদকে ধ্বংস করবে বলে লেনিন মনে করতেন। দেশের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক–অর্থনীতিতে প্রতিক্রিয়াশীল নীতি গ্রহণের কারণে যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি যেমন অশান্ত হয়ে উঠেছে তেমনি বহির্বিশ্বে ব্যাপক দমন নীতির কারণে বিশ্বব্যাপী মার্কিনিদের প্রতি ঘৃণা ও অসন্তোষ বৃদ্ধি পাচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় সমস্যাগুলোর মধ্যে রয়েছে কর নীতির সমালোচনা, বাণিজ্যিক সংস্থাগুলোতে ঘুষ ও ব্যাপক দুর্নীতি, নাগরিকদের ব্যক্তিগত সঞ্চয়ের অভাব, বিরাট ঋণের বোঝা, মধ্যপ্রাচ্যের তেলের ওপর অতিরিক্ত নির্ভরতা,ডলার হেজিমনি ভেঙ্গে পড়ার আশঙ্কা প্রভৃতি। এসব সংকট মোচনের জন্য তারা যুদ্ধকে বেছে নিচ্ছে। মনে রাখা প্রয়োজন, শুধুমাত্র তেলের দখলদারিত্বের জন্য ইরাক যুদ্ধ সংঘটিত হয়নি, ‘ডলার হেজিমনি রক্ষা’ও ছিল অন্যতম উদ্দেশ্য। সুতরাং, ইরাক আক্রমণ ছিল একদিকে মার্কিন পুঁজিপতিদের শ্রেষ্ঠত্ব ও আধিপত্য রক্ষার লড়াই, অপরদিকে, পেট্রোলিয়াম উৎপাদক দেশগুলোর জন্য এক ধরনের হুশিয়ারি যে, ডলার ত্যাগ করার পরিণতি কি হতে পারে তা দেখিয়ে দেয়া।

কিন্তু এ ভয়ংকর যুদ্ধ বিশ্বজুড়ে কোটি মানুষকে ঠেলে দিয়েছে চরম দুর্ভোগের দিকে। ইরাক যুদ্ধের জন্য যে বিপুল অঙ্কের সামরিক ব্যয় বুশ নির্ধারণ করেছিলেন তা ছিল প্রতিরক্ষা বাজেটের জন্য নির্ধারিত অর্থের বাইরে। বাজেট অফিস জানায়, সরকারের পক্ষে এ ব্যয়ভার বহন করা সম্ভব নয়। তখন প্রতিদিন ২৮ লক্ষ ব্যারেল তেল উত্তোলন করলেই যুদ্ধে ব্যয়কৃত অর্থ উঠে আসবে বলে যুক্তি দেয়া হয়েছিল।[২২] এ বিপুল সামরিক ব্যয়কে বৈধতা দেয়া হয়েছিল জনগণের চরম দুঃখ-কষ্ট, ত্যাগ ও নানা জাতীয় দুর্গতির ভার বহনের মধ্য দিয়ে। বিপুল ব্যয়ভার বহনকারী এ ধ্বংসাত্মক যুদ্ধের অব্যবহিত পর যুক্তরাষ্ট্রে বেকারের সংখ্যা ১ কোটি ১০ লক্ষে পৌঁছে। মার্কিন শ্রমদপ্তরের সমীক্ষা অনুসারে, এ হার তখন ৬.২ শতাংশে পৌঁছেছিল।[২৩] এ হার এখনও ক্রমবর্ধমান। শুধু চাকুরী হারানো নয়, রাষ্ট্রীয় পরিষেবা খাত সংকুচিত করে এবং রাষ্ট্রের বহু সেবাখাত বন্ধ করে দিয়ে জনগণের মৌল মানবিক চাহিদাকে উপেক্ষা করে এ যুদ্ধের ধ্বংসযজ্ঞের ব্যয়ভার বহন করা হয়। এভাবে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ধ্বংসযজ্ঞের শিকার হয়ে একটি ধনী দেশের জনগণ কিভাবে নিঃস্ব ও সর্বস্বান্ত হতে পারে ইরাক যুদ্ধ তার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। শুধুমাত্র আর্থিক ক্ষয়-ক্ষতি নয়, জনগণের জীবন, স্বাস্থ্য ও পরিবেশকেও দিতে হয় চরম মূল্য। ১২ লাখেরও বেশি প্রাণক্ষয়, তাৎক্ষণিকভাবে বোমারু বিমানের শব্দে আড়াই লাখ শিশুর বধির হয়ে যাওয়া, রাসায়নিক ও জীবাণু অস্ত্রের প্রভাবে ক্যান্সারসহ নানা মরণঘাতি ও সংক্রামক ব্যাধিতে আক্রান্ত হওয়া ছিল ইরাকিদের অনিবার্য নিয়তি।

সাম্প্রতিক বিশ্বে আশঙ্কাজনকভাবে সহিংসতা বৃদ্ধি পাওয়ায় অসহায় ও দুর্দশাগ্রস্ত মানুষের সংখ্যাও বেড়ে যাচ্ছে। ক্ষয়িষ্ণু পর্বে এসে মরিয়া হয়ে ওঠা সাম্রাজ্যবাদ বিশ্বজুড়ে সামরিকায়ন তীব্রভাবে বাড়িয়ে তুলছে। এ বিপুল ব্যয়ভার নির্বাহ করতে গিয়ে দেশের অর্থনীতিতে সৃষ্টি হচ্ছে ভারসাম্যহীনতা। দেশজুড়ে দেখা দিচ্ছে জনঅসন্তোষ। অপরদিকে, বিশ্বজুড়ে মার্কিন সমরবাদের শিকার কোটি কোটি মানুষও বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠছে সাম্রাজ্যবাদের প্রতিক্রিয়াশীল নীতির বিরুদ্ধে। আজকের তথ্য-প্রযুক্তির বিপ্লবের যুগে মানুষের কাছে আর শোষণের চরিত্র আড়াল করে রাখা সম্ভব হচ্ছে না। সামাজিক মিডিয়ার বদৌলতে মানুষের কাছে প্রতিদিনই পৌঁছে যাচ্ছে নির্যাতনের লোমহর্ষক ইতিবৃত্ত। ফিলিস্তিন প্রসঙ্গেই আসা যাক। আগে যুক্তরাষ্ট্রে যত বেশীসংখ্যক মানুষ ফিলিস্তিনবিরোধী ছিল, এখন তার সংখ্যা কমছে। সুতরাং, প্রচলিত মিডিয়ার মিথ্যা তথ্য দিয়ে আগে মানুষকে যত সহজে ভুলিয়ে রাখা যেতো, এখন তা আর সম্ভব হচ্ছে না। ফেসবুক ও টুইটারে নিয়মিত ছড়িয়ে পড়ছে ইসরাইলের বর্বরতার চিত্র, সেইসঙ্গে উন্মোচিত হয়ে যাচ্ছে তার রক্ষক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অমানবিক ও অযৌক্তিক নীতিহীন চরিত্রটিও। তাছাড়া সাম্রাজ্যবাদের আগ্রাসন, দখলদারিত্ব ও প্রভাব বিস্তারের পথটি মোটেও মসৃণ নয়। পূর্বে দাসত্বের শৃঙ্খলে থাকা বহু দেশই এখন মার্কিন প্রভাববলয় থেকে বেরিয়ে স্বনির্ভর রাষ্ট্র নীতি গ্রহণ করেছে। লাতিন আমেরিকান দেশগুলোই তার জ্বলন্ত প্রমাণ। এক সময় মার্কিন প্রভাবাধীনে থেকে যে দেশগুলো নিজ দেশের জনগণের ওপর নিপীড়নের পাশাপাশি বহির্বিশ্বে প্রতিক্রিয়াশীল নীতির বাস্তবায়নে সক্রিয় ভূমিকা রেখেছে, তারা এখন মার্কিনবিরোধী অবস্থান গ্রহণ করে বিশ্বময় প্রগতিবাদী কর্মকাণ্ডে উৎসাহ যোগাচ্ছে। এখানেও ফিলিস্তিন প্রসঙ্গ প্রণিধানযোগ্য। ইসরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় পূর্ববর্তী লাতিন আমেরিকার শাসক গোষ্ঠী অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। রাজনৈতিক পরিবর্তনের নতুন স্রোতধারায় এ লাতিন শাসক গোষ্ঠী এখন অত্যন্ত বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখছে ফিলিস্তিনিদের সমর্থন দানে ও ইসরাইলি বর্বরতার বিরুদ্ধে। সামাজিক প্রচার- মাধ্যমগুলোতে তারা ইসরাইলি নৃশংসতার বিরুদ্ধে ব্যাপক প্রচারণা চালিয়েছে। এছাড়া ফিলিস্তিনিদের মানবিক সহায়তা প্রদানসহ জাতিসংঘে ইসরাইলের বিরুদ্ধে যুদ্ধপরাধের অভিযোগ আনা ও এর সুষ্ঠু তদন্তের দাবিতেও তারা পালন করেছে অগ্রনী ভূমিকা। সম্প্রতি ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলোও ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের স্বীকৃতির পক্ষে অবস্থান নিয়েছে যা বিশ্বজুড়ে যুক্তরাষ্ট্রের একঘরে হয়ে পড়ার প্রবণতাকে সুস্পষ্ট করেছে।

সম্প্রতি সিআইএর নির্যাতনের প্রতিবেদন প্রকাশিত হওয়ার পর মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের মানবতার খোলসটি আর বিশ্ববাসীর কাছে গোপন থাকলো না। বিশ্ব সম্প্রদায় যখন এ পাশবিকতার বিরুদ্ধে ক্রুদ্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করছে, সেই মুহূর্তে যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক ভাইস প্রেসিডেন্ট ডিক চেনি দাবি করেছেন, বেআইনি কিছুই করা

হয়নি। বিচার বিভাগীয় অনুমোদনের পরই এই টেকনিক ব্যবহার করা হয়। তাঁর এ অনৈতিক বক্তব্যকে 'ফালতু' বলে উড়িয়ে দিয়ে ভাষ্যকার রে ম্যাকগভার্ন পাল্টা প্রশ্ন রেখেছেন, ধর্ষণ বা দাসপ্রথা অনুমোদিত হলেই কি তা বৈধ হয়ে যায়? একইভাবে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া এসেছে জাতিসংঘ থেকেও। জাতিসংঘের সন্ত্রাসবিরোধী ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা বেন এমেরসন বলেছেন, অপরাধমূলক ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে যারা নির্যাতন চালিয়েছে, এখন সময় এসেছে তাদের বিচার করার। শুধু তারাই নয়, নির্যাতন যারা অনুমোদন করেছে, তাদের বিরুদ্ধেও সর্বোচ্চ শাস্তির বিধান থাকা আবশ্যক। জাতিসংঘের মানবাধিকার হাইকমিশনারও সুস্পষ্টভাবে জানিয়েছেন, আমেরিকা নির্যাতনবিরোধী চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। এ চুক্তি অনুযায়ী নির্যাতনকারীদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নিতে মার্কিন সরকার বাধ্য।[২৪] সুতরাং, সাম্রাজ্যবাদী নির্যাতনের প্রতিবাদ এখন মানবাধিকার সংস্থাগুলো ও মার্কিনবিরোধী রাষ্ট্রগুলোর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, জাতিসংঘ থেকেও জোরালোভাবে শক্তিধরদের বিচারের দাবি আসছে। শুধু তাই নয়, নির্যাতন প্রতিবেদনে ব্রিটিশ গোয়েন্দাদের সম্পৃক্ততার তথ্য থাকায় মার্কিনিদের সঙ্গে তাদের প্রধান মিত্র ব্রিটিশদেরও সম্পর্কের টানাপোড়েন দেখা দিয়েছে। ভিয়েতনাম যুদ্ধের পর আফগানিস্তান, ইরাক, লিবিয়ায় একের পর এক ব্যর্থ ও ধ্বংসাত্মক যুদ্ধ শাসক শ্রেণীর প্রতি জনগণের আস্থাহীনতাকেই বাড়িয়ে তুলেছে। প্রতিটি ক্ষেত্রেই গোপন নথি প্রকাশিত হওয়ার পর জনগণ যুদ্ধের অসারতা উপলব্ধি করেছে। তাদের গণবিধ্বংসী যুদ্ধের পরে প্রতিটি দেশেই গৃহযুদ্ধের সূত্রপাত ঘটেছে যা আজও বন্ধ হয়নি। প্রতিটি ক্ষেত্রেই মার্কিন সমর্থিত সরকারকে জনগণ প্রত্যাখ্যান করেছে। অর্থাৎ, যুদ্ধ অর্থনীতি সাম্প্রতিককালে স্বদেশে ও বহির্বিশ্বে গণঅসন্তোষ, অনাস্থা সৃষ্টি করছে। তার মিত্র ন্যাটোভুক্ত সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সঙ্গেও বিরোধ সৃষ্টি হয়েছে। ইরাক যুদ্ধ যে ডলার-ইউরোর দ্বন্দ্বকে ঘিরে শুরু হয়েছিল তা কারও অজানা নয়। সম্প্রতি ইউরোপীয় দেশগুলো যুক্তরাষ্ট্রের নজরদারিতে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছে। এক পর্যায়ে ইইউ যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে তথ্য বিনিময় চুক্তি বাতিলেরও হুমকি দেয়। চীন-রাশিয়ার সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের দ্বন্দ্ব বহু পুরনো। তবে তারা ইদানীং ইরান ও সিরিয়ার পক্ষে শক্ত অবস্থান গ্রহণ করায় পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদ নতুন করে চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছে। তাদের সমর্থনপুষ্ট সরকারগুলোর পক্ষ থেকেও সমালোচনা আসছে। যেমন, সৌদি আরবের সাবেক গোয়েন্দা প্রধান সম্প্রতি সিরিয়া সংঘাতের জন্য পশ্চিমাদের দায়ী করেছেন। দুই বছরে দুই লাখ সিরীয় নিহত হওয়ার পর পশ্চিমারা আইএস জঙ্গি দমনের নামে এক মাসে ৫৮৫ জনকে হত্যা করে। হামাস নেতা মুসা আবু মারজুক অত্যন্ত বলিষ্ঠভাবে দাবি করেছেন, হামাস ও মুসলিম ব্রাদারহুডের মতো দলগুলোর সংগ্রাম ক্ষতিগ্রস্ত করতে পাশ্চাত্যের কয়েকটি দেশ আইএস সৃষ্টি করেছে। চীনা পত্রিকা *পিপল্স ডেইলি* এ বিষয়টিকে 'বাঘকে ইচ্ছে করে সামনে নিয়ে আসা'র সঙ্গে তুলনা করে। পত্রিকাটির

দাবি, পশ্চিমারাই মধ্যপ্রাচ্যে সন্ত্রাস উসকে দিচ্ছে। অপরদিকে, ওআইসিভুক্ত দেশগুলো যেখানে মার্কিন মদদপুষ্ট রাজতান্ত্রিক সরকারেরই প্রধান্য বেশি তারাও সম্প্রতি নির্যাতিত ফিলিস্তিনি জনগণের ওপর ইসরাইলি বাহিনীর বর্বরতার খবর মুসলিম দেশগুলোর গণমাধ্যমে ফলাও করে প্রচার করার অঙ্গীকার করেন। অতএব, আজকের সাম্রাজ্যবাদের অভ্যন্তরে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলোর ক্ষমতার দ্বন্দ্ব, সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রের সঙ্গে তৃতীয় বিশ্বের দ্বন্দ্ব–এ ত্রিবিধ দ্বন্দ্বই অত্যন্ত সুস্পষ্ট রূপ লাভ করেছে। এ দ্বন্দ্ব থেকেই লেনিন পতনের পূর্বাভাস দিয়েছিলেন। বর্তমান সময়ে ব্যাপকভাবে জনদুর্ভোগ বৃদ্ধি পাওয়ায় গণমানুষের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার পথ তৈরি হচ্ছে এবং বিপ্লবের প্রবণতাগুলোকে নতুনভাবে উজ্জীবিত করছে।

বিপ্লবের তৃতীয় অপরিহার্য শর্ত হলো জনগণের কার্যক্রম উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পাওয়া। সাধারণভাবে জনগণ অপেক্ষাকৃত শান্ত থাকলেও সংকটকালে পরিস্থিতিই তাকে বাধ্য করে স্বনির্ভর বিপ্লবী কর্মসূচী গ্রহণ করতে।[২৫] সম্প্রতি ফার্গুসন, অ্যারিজোনা, নিউ ইয়র্কের স্ট্যাটেন আইল্যান্ড ও ব্রুকলিন, ফ্লোরিডা, ওহাইও, ক্লিভল্যান্ড, সাউথ ক্যারোলিনায় শ্বেতাঙ্গ পুলিশের হাতে একের পর এক কৃষ্ণাঙ্গের মৃত্যু ঘটলে যুক্তরাষ্ট্রের ৬০টি শহরে ব্যাপক গণবিক্ষোভ ও সহিংসতা ছড়িয়ে পড়ে। পরবর্তীতে এ আন্দোলন বর্ণবাদের বিরুদ্ধে নাগরিক সংহতিতে পরিণত হয়। এ গণঅসন্তোষ একদিনে সৃষ্টি হয়নি, বৈষম্যভিত্তিক সমাজে দীর্ঘদিন ধরে পুঞ্জীভূত ক্ষোভের চূড়ান্ত অভিব্যক্তি ঘটে আজকের এ গণআন্দোলনের মধ্য দিয়ে। হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েও ন্যায়বিচার পেতে ব্যর্থ কৃষ্ণাঙ্গরা রাজপথ বিক্ষোভে মুখরিত করে। এ বিক্ষোভে অংশ নিয়েও তাদের পুলিশি নির্যাতন, হয়রানি ও গ্রেফতারের শিকার হতে হয়। ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বরের পর থেকে হোমল্যান্ড সিকিউরিটির নামে যুক্তরাষ্ট্রে আইন প্রয়োগকারী বাহিনীর ক্ষমতা অতিরিক্ত বৃদ্ধি পায়। কিন্তু এর নির্মম শিকারে পরিণত হয় সেদেশের কৃষ্ণাঙ্গ জনগোষ্ঠী। ২০১০ সালে মিশেল আলেকজান্ডার তাঁর *দ্য নিউ জিম ক্রোঃমাস ইনকারনেশন ইন দি এইজ অব কালার ব্লাইন্ডনেস* গ্রন্থে দেখিয়েছেন, যুক্তরাষ্ট্রের বিচার ব্যবস্থা, বিশেষ করে ফৌজদারি ব্যবস্থা এমন রূপ নিয়েছে যে তাকে বাইরে থেকে কৃষ্ণাঙ্গদের জন্য প্রতিকূল মনে না হলেও মর্মবস্তুর দিক থেকে তা অনেকাংশেই তাদের বিরুদ্ধে। তিনি মনে করেন, ষাটের দশকে নাগরিক অধিকার আন্দোলনের মাধ্যমে যা অর্জিত হয়েছিল, আজ তা থেকেই এই নাগরিকেরা বঞ্চিত। বিশেষত সত্তরের দশক থেকে 'ওয়ার অন ড্রাগ' নাম করে যে মাদকদ্রব্যবিরোধী অভিযান চালানো হচ্ছে তার মাধ্যমে কৃষ্ণাঙ্গদের সমাজকেই ধ্বংস করে দেয়া হচ্ছে।[২৬]

এ থেকে প্রমাণিত হয়, ক্ষয়িষ্ণু পর্বের পুঁজিবাদ আগের চেয়ে পশ্চাদমুখী। একবিংশ শতাব্দীতে এসে এটি নতুন করে পুরাতন রক্ষণশীল ও শোষণমূলক নীতি

গ্রহণ করেছে যা সমাজদেহে গভীর ক্ষত ও ভারসাম্যহীনতা তৈরি করেছে। চলতি বছরের বর্ণবাদবিরোধী আন্দোলনের মতো গত বছরেও অভিবাসী সংস্কার আইন পাসের দাবিতে লাখো মানুষের সমাবেশ হয়েছিল। ২০১১ সালে দেখা দিয়েছিল 'অকুপাই ওয়ালস্ট্রীট আন্দোলন'। গ্রেফতার, হয়রানি বা প্রাণহানির মতো আশঙ্কাকে তুচ্ছ করে স্বতঃস্ফুর্তভাবে মানুষ এসব প্রতিবাদে অংশ নেয়। মার্কস বলেছিলেন, মানুষের যখন শৃঙ্খল ছাড়া আর কোনোকিছু হারানোর ভয় থাকবে না, তখনই সে বিপ্লবী আন্দোলন গড়ে তুলবে। অর্থাৎ শোষণ যখন চূড়ান্ত রূপ ধারণ করবে, তখন মানুষ জীবন-মৃত্যুকে পরোয়া না করে শোষণমূলক কাঠামো ভেঙ্গে ফেলতে চাইবে। সাম্প্রতিককালে দারিদ্র, বেকারত্ব, সর্বোচ্চ আয়বৈষম্য, বর্ণবৈষম্য কবলিত মার্কিন সমাজে নাগরিকদের একটি বড় অংশের মধ্যে এই প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

আন্দোলন মানেই গণজাগরণ। মার্কিন সমাজে বর্তমানে অন্য যেকোনো সময়ের তুলনায় অধিক মাত্রায় নাগরিক সচেতনতা সৃষ্টি হয়েছে। গণনির্যাতন বন্ধের দাবিতে আন্দোলনরত সংগঠন 'স্টপ মাস ইনকারনেশন নেটওয়ার্ক' অনেক আগে গঠিত হলেও এবারের বর্ণবাদবিরোধী আন্দোলনে তারাই নেতৃত্ব দিয়েছে। এছাড়া কৃষ্ণ অধিকার আন্দোলন, ন্যাশনাল এ্যাসোসিয়েশন ফর এ্যাডভান্সমেন্ট অব কালারড পিপলের সদস্য ও নাগরিক অধিকারকর্মীরা ফার্গুসন থেকে মিজৌরীর রাজধানী জেফারসন সিটি পর্যন্ত পুরো ১২৭ মাইল হেঁটে প্রতিবাদ মিছিলে অংশ নিয়েছেন। অনেকেই বলছেন, ষাটের দশকে মার্টিন লুথার কিং-এর নেতৃত্বে এদেশে যে নাগরিক অধিকার আন্দোলন হয়েছিল, আজকের আমেরিকায় সেই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হচ্ছে। এর প্রতিক্রিয়ায় বামপন্থী সাপ্তাহিক *নেশন* লিখেছে, এ মুহূর্তে আমেরিকায় যা ঘটছে তা শুধু প্রতিবাদ ঝড় নয়, এ এক নাগরিক অভ্যুত্থান। বৈষম্যবিরোধী এ আন্দোলনের লক্ষ্যমাত্রা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে নাগরিক অধিকার নেতা আর্ল শাপটন বলেছেন, এদেশের বিচারব্যবস্থা দুই ধরনের— একটি শ্বেতকায় ও উচ্চবিত্তের জন্য, অন্যটি কালো ও নিম্নবিত্তের জন্য। এ কারণেই আজকে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট থেকে শহরের মেয়র, পুলিশ, প্রধান ধর্মীয় নেতা ও সাধারণ নাগরিক সবাই এ ব্যাপারে একমত যে, চলতি বর্ণবাদী ব্যবস্থার পরিবর্তন দরকার।[২৭]

উল্লেখ্য যে, মার্কসের সময়কালে ব্রিটেন ও আমেরিকায় সামরিক চক্র ও আমলাতন্ত্রের অনুপস্থিতি লক্ষ্য করে তিনি সেখানে শান্তিপূর্ণ বিপ্লব সংঘটনের সম্ভাবনা দেখেছিলেন। কিন্তু লেনিন দেখান, বিংশ শতাব্দীতে এ অবস্থার বিরাট পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। তাই এ দুটি রাষ্ট্রে এখন আর শান্তিপূর্ণ বিপ্লব সম্ভব নয়, বরং সশস্ত্র বিপ্লবের পথ বেছে নিতে হবে। সাম্প্রতিককালে একবিংশ শতাব্দীতে এ রাষ্ট্রগুলো নব্য-রক্ষণশীল নীতি গ্রহণ করে সর্বোচ্চ সামরিকীকরণের দিকে ঝুঁকেছে। এমতাবস্থায় জনগণের সামজিক আন্দোলনগুলো রাজনৈতিক আন্দোলনে রূপ নিতে পারছে না রাষ্ট্রযন্ত্রের নির্মম

দমনমূলক কাঠামোর কারণে। জন স্টুয়ার্ট মিলের উদারপন্থী মতবাদের প্রভাবে একসময়ে ব্রিটেনে কিছু মানবীয় স্বাধীনতার স্বীকৃতি ও গণতন্ত্রের চর্চা শুরু হলেও বিংশ শতাব্দীতে বুর্জোয়া শ্রেণী নিজেদের আধিপত্য ও শোষণ প্রক্রিয়া টিকিয়ে রাখার জন্য পীড়নমূলক রাষ্ট্রনীতি গ্রহণ করে। এতে রাষ্ট্রের মাধ্যমে জনগণের অধিকার আদায়ের আন্দোলনগুলো দমনের পথ তৈরি হয়। অন্যদিকে, অভ্যন্তরীণ বিপ্লব দমন ও নিজেদের পুঁজি পুঞ্জীভবনের পথ সুগমের জন্য শোষণমূলক ঔপনিবেশিক নীতির প্রয়োগ ঘটানো হয়। একবিংশ শতাব্দীতে আবার নতুন করে রক্ষণশীলবাদের প্রাধান্য ঘটায় ব্রিটেন আবার পূর্ণ সামরিকীকরণের পথে ফিরে এসেছে। এতে তৃতীয় বিশ্বের সরকারগুলোর নিপীড়নমূলক পদক্ষেপের সাহায্যে সাম্রাজ্যবাদের দূরভিসন্ধি ও প্রতিক্রিয়াশীল নীতি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন সহজ হয়ে যায়। এ সামরিকীকরণ মানুষের শিক্ষা-স্বাস্থ্যের ন্যূনতম অধিকারটুকু কেড়ে নিয়ে তাদেরকে নির্বিচারে হত্যা, নির্যাতন, অযাচিতভাবে জেল-জরিমানা ও হয়রানির শিকারে পরিণত করবে। এ প্রসঙ্গে ব্রিটিশ উন্নয়ন সংস্থা অক্সফাম জানিয়েছে, ব্রিটিশ করদাতারা তাদের সাহায্যের টাকায় হাসপাতাল তৈরি দেখতে চায়, সামরিক বাহিনীর হেলিকপ্টার কেনায় অংশ নিতে চায় না। সুতরাং, বিংশ শতাব্দীতে যেমন ব্রিটিশ সরকার জনগণের টাকায় ভারতে ব্যবসারত ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির পুঁজির পুঞ্জীভবনে সহযোগিতা করতো, আজকে তেমনি দেশে-বিদেশে সামরিকীকরণের মাধ্যমে বিশ্বময় মানুষের নাগরিক অধিকার আন্দোলনের লড়াইকে থামিয়ে দিতে চায়।

মার্কিন নেতৃত্বাধীন নব্য সাম্রাজ্যবাদের অর্থনীতি মূলত যুদ্ধনির্ভর। তাই ইরাক থেকে সেনা প্রত্যাহার ও আফগানিস্তান থেকে ২০১৪ সাল নাগাদ মোট সামরিক ব্যয়ের ৪০ শতাংশই এখন পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্র করছে। ২০১২ সালেও দেশটি সামরিক খাতে ৬৮ হাজার ২০০ কোটি ডলার ব্যয় করে। এই ব্যয়ের পরিমাণ যুক্তরাষ্ট্রের পরে সামরিক খাতে সর্বোচ্চ ব্যয় করা ১৩টি দেশের মোট ব্যয়ের চেয়ে বেশি।[২৮] মার্কিন চলচ্চিত্রগুলোও অস্ত্রনির্ভর সহিংসতায় পরিপূর্ণ। তাই সাধারণ মানুষের মধ্যেও এক ধরনের মারমুখী মনোভাব সৃষ্টি হচ্ছে এবং তা সমাজে অপরাধ প্রবণতা বাড়িয়ে তুলছে। প্রেসিডেন্ট সিনিয়র বুশ উপসাগরীয় যুদ্ধের পর স্বীকার করেছিলেন, এ যুদ্ধে যতসংখ্যক সৈন্য প্রাণ হারিয়েছিল, প্রতি বছর শুধুমাত্র নিউ ইয়র্ক শহরে আততায়ীর গুলিতে তার চেয়ে বেশীসংখ্যক মানুষ প্রাণ হারায়। সমাজজীবনে এত বিপর্যয় নেমে আসার পরও অস্ত্র ব্যবসায়ীরা মুনাফার লোভে এ ব্যবসা কমাচ্ছে না, বরং বাড়াচ্ছে। কারণ অন্য যেকোনো ব্যবসার চেয়ে অস্ত্র ব্যবসা অধিক লাভজনক। এসব নানা সুবিধা মুনাফাখোর পুঁজিবাদকে করে তুলেছে প্রাণঘাতী অস্ত্রকেন্দ্রিক দানব। এ অস্ত্র ব্যবসাকে টিকিয়ে রাখার জন্য তারা বিশ্বব্যাপী সহিংস কর্মকাণ্ডে উৎসাহ জোগায়। সিআইএর প্রত্যক্ষ মদদে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে নিচু মাত্রার যুদ্ধ ও গৃহযুদ্ধের পরিস্থিতি সৃষ্টি করে রাখা হয়।

২০১৪ সাল ছিল সবচেয়ে সহিংসতম বছর। এ সময়ে সারা বিশ্বজুড়ে সহিংসতা ছড়িয়ে পড়ে। অধিকাংশ রাষ্ট্র গণতন্ত্র ত্যাগ করে একনায়কতন্ত্রের দিকে ঝুঁকেছে। বেশীর ভাগ দেশ যুক্তরাষ্ট্রের কথিত সন্ত্রাসবাদবিরোধী যুদ্ধের অংশীদার হওয়ায় তারাও যুক্তরাষ্ট্রের মতো পুলিশি রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে। অর্থাৎ, যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক বিশ্বায়ন এখন বিশ্বব্যাপী তার নিয়ন্ত্রণ, নিপীড়ন ও আধিপত্য প্রতিষ্ঠায় অন্য যেকোনো সময়ের চেয়ে সবচেয়ে বেশি প্রতিক্রিয়াশীল। এ সমরবাদী অর্থনীতির ভার বহন করতে গিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের আয়বৈষম্যও এখন সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছেছে। মার্কিন গবেষণা প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, ২০১৩ সালে মার্কিন ধনী পরিবারগুলোর গড় আয় ছিল ৬ লাখ ৩৯ হাজার ৪০০ ডলার। মার্কিন গবেষণা প্রতিষ্ঠান পিউ রিসার্চ সেন্টারের গবেষণা থেকে জানা যায়, একই সময়ে মধ্যবিত্ত পরিবারগুলোর গড় আয় ছিল ৯০ হাজার ৫০০ ডলার। আর নিম্নবিত্ত পরিবারগুলোর সঙ্গে ধনী পরিবারগুলোর আয়ের বৈষম্য গড়ে ৭০ শতাংশ বেশি। বৈশ্বিক মন্দার পর মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত পরিবারগুলো যেখানে ব্যাপকভাবে সম্পদ হারায়, সেখানে ঐ একই সময়ে মার্কিন ধনকুবেররা তাদের হারানো সম্পদ উদ্ধার করতে সক্ষম হয়। এটিই ধনী-দরিদ্রের সম্পদের বৈষম্যকে আরও প্রকট করেছে। গবেষণা প্রতিবেদনটিতে আরও বলা হয়, গত ৩০ বছরে যুক্তরাষ্ট্রের ধনী পরিবারগুলোর সম্পদের পরিমাণ গড়ে ১০০ শতাংশ বেড়েছে। অন্যদিকে, মধ্যবিত্ত পরিবারগুলোর সম্পদ বেড়েছে গড়ে মাত্র ২.৩ শতাংশ। এ পরিসংখ্যানই প্রমাণ করে, সম্পদের বৈষম্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কতটা প্রকট। বিশ্বমন্দা কাটিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতি ঘুরে দাঁড়ানোর পরও প্রত্যাশিত হারে আয় ও মজুরি বৃদ্ধি না পাওয়াকে আয় বৈষম্য বৃদ্ধির আরেকটি বড় কারণ বলে মন্তব্য করেছে পিউ রিসার্চ। এ প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, মন্দার পর মার্কিন পুঁজিবাজার ঘুরে দাঁড়ালেও এর সুফল শুধু ধনী পরিবারগুলোই ভোগ করেছে। ফলে পুঁজি বাজারে ধনী পরিবারগুলোর আধিপত্য আরও বেড়েছে।[২৯]

এ অন্যায়ের বিরুদ্ধেই 'ওয়ালস্ট্রীট দখলে করো' আন্দোলনে স্লোগান উঠেছিল: 'আমরাই ৯৯ শতাংশ'। এ স্লোগানটি ছিল প্রচলিত ক্ষমতার কাঠামোর প্রতি একটি মৌলিক চ্যালেঞ্জ। এখানে আন্দোলনকারীরা সমাজের বৃহত্তর শ্রেণী বিভাজনটিকে অত্যন্ত সুস্পষ্ট ও সক্রিয়ভাবে তুলে ধরে। এ অপরাধে লক্ষাধিক আন্দোলনকারীকে নিয়মিত পুলিশের সামরিক প্রতিরোধের মুখোমুখি হতে হয়। এভাবে ১% কর্পোরেট ও ব্যাংক এলিটরা তাদের বর্ধিত ক্ষমতা ও নিষ্ঠুরতার মাধ্যমে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান ও অনুশীলনের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করে দেশ শাসন করছে। এই ১ শতাংশের শোষণ এখন আর এক দেশেই সীমাবদ্ধ থাকছে না, বিশ্বায়নের মাধ্যমে এই ১ শতাংশ এখন বিশ্বময় অন্য যেকোনো অধিকারের ঊর্ধ্বে বিনিয়োগের অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। তারা বিভিন্ন দেশে মুক্ত বাজারের পথে বাধা সৃষ্টিকারী পরিবেশ, শ্রম ও স্বাস্থ্য সুরক্ষার মানদণ্ড সম্বলিত আইনগুলো বাতিল করে চলেছে। বিশ্বায়ন উৎপাদনের ওপর

একচেটিয়া আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করেছে, কর্পোরেশনগুলোকে উচ্চমাত্রায় ভর্তুকি প্রদানের মাধ্যমে ক্ষুদ্র উৎপাদক ও কৃষকদের জীবনধারণকে বিপন্ন করে তুলেছে। এমনকি বিশ্বায়ন প্রকৃতিকেও কর্পোরেশনগুলোর একচেটিয়া সম্পদে পরিণত করেছে। আমাদের জীবনধারণের মৌলিক উপকরণসমূহ কৃষিবীজ, চাল, শস্য, এমনকি বৃষ্টিজলের ওপরও কর্পোরেশনগুলোর একচ্ছত্র আধিপত্য প্রতিষ্ঠার সুযোগ করে দিয়েছে। এটি মুক্তবাণিজ্য নয়, এটি হচ্ছে একচেটিয়া বিনিয়োগ। এর ফলাফল শুধুমাত্র ঐ এক শতাংশ ছাড়া তৃতীয় বিশ্ব ও পুঁজিবাদী বিশ্বের উভয়ের জনগণের জন্যই ধ্বংসাত্মক হয়েছে।[৩০] এই এক শতাংশের জন্য মুনাফার পাহাড় গড়তে পুঁজিবাদ এখন একের পর এক সংকট মোকাবেলা করে চলেছে।

আধিপত্যবাদ সবসময়ই বহুপাক্ষিক ও আপেক্ষিক। এই আপেক্ষিকতার কারণে তাকে হুমকির মধ্যে থাকতে হয় বিভিন্নভাবে। বহুপাক্ষিক এ অর্থে যে, বিশ্ব পুঁজিবাদী অর্থনীতি শুধুমাত্র অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকেই নিয়ন্ত্রণ করছে না, একইসঙ্গে এটি রাজনৈতিক, আদর্শিক (এমনকি সাংস্কৃতিক) এবং সামরিক কর্মকাণ্ডেরও নিয়ন্ত্রক। এটি আপেক্ষিক এজন্য যে, বিশ্ব পুঁজিবাদী অর্থনীতি কোনো একক শক্তি দ্বারা বিশ্ব সাম্রাজ্য গড়ে তোলেনি, আধিপত্যশীল কেন্দ্রগুলোর সমঝোতার ভিত্তিতেই এ সাম্রাজ্য গড়ে উঠেছে। তাদের নিজস্ব সমঝোতা ছাড়াও নিয়ন্ত্রিত রাষ্ট্রগুলোর অবস্থান পরিবর্তনও অনেক সময় সাম্রাজ্যবাদের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়ায়। বিশ্বব্যবস্থার অংশীদারদের মধ্যকার পরিবর্তিত শক্তির সম্পর্কের ভিত্তিতে টিকে থাকা আধিপত্যকে সবসময় হুমকির মধ্যে থাকতে হয়।[৩১] ইতোমধ্যে যুক্তরাষ্ট্র কেন্দ্রের নেতা হিসেবে তার দায়িত্ব পালন বন্ধ করে দিয়েছে। নিষ্ঠুর যুদ্ধের মাধ্যমে পুঁজি রপ্তানি অক্ষুণ্ন রাখলেও অন্যদের পুঁজি রপ্তানির সুযোগ সৃষ্টি করে দিচ্ছে না। কেন্দ্রের দেশগুলোর ওপর রাজনৈতিক ও সামরিক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে সে তার আধিপত্য রক্ষা করছে। এখন প্রশ্ন, কতদিন অন্যান্য শক্তিগুলো এ নিয়ন্ত্রণ মেনে নেবে? তাছাড়া বহির্বিশ্বের রাজনীতি নিয়ন্ত্রণে যে বিপুল অর্থভাণ্ডার যুক্তরাষ্ট্রকে ব্যয় করতে হচ্ছে তা তার অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতিকে আরও নাজুক ও দুর্বল করে ফেলছে। যুক্তরাষ্ট্র সাম্প্রতিক দশকে যুদ্ধংদেহী নীতি গ্রহণ করায় এর অর্থনীতি মারাত্মকভাবে অসম হয়ে পড়েছে। এতে সে সমাজের সবচেয়ে দুর্বল অংশটি আরও মানবেতর অবস্থায় চলে গেছে। ব্যাপক হারে কেন্দ্রীভবনের সঙ্গে সঙ্গে করও হ্রাস করা হচ্ছে। এর ফলাফল হচ্ছে, শিক্ষা ও শিশু সুরক্ষার মতো জনকল্যাণমূলক কাজে বিনিয়োগের হার কমে যাওয়া। একারণে একমাত্র রুমানিয়া ছাড়া অন্য যেকোনো উন্নত দেশের চেয়ে যুক্তরাষ্ট্রে শিশু দারিদ্রের হার বেশি। সামগ্রিকভাবে যুক্তরাষ্ট্রের ১৪.৫ ভাগ মানুষ দরিদ্র হলেও শিশুদের মধ্যে ১৯.৯ ভাগই দারিদ্রের মধ্যে বসবাস করে যার সংখ্যা এখন প্রায় দেড় কোটি। ব্রিটেনের চেয়ে যুক্তরাষ্ট্রে শিশু দারিদ্রের হার দুই-তৃতীয়াংশ বেশী, আর নর্ডিক দেশগুলোর চেয়ে চার গুণ বেশি।[৩২]

যুগ যুগ ধরে যুক্তরাষ্ট্র অসম রাষ্ট্রব্যবস্থা কার্যকর রেখে ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য সৃষ্টি করে বর্ণবাদ ও মহাজনী মোড়লতন্ত্র টিকিয়ে রেখেছে। এই এক শতাংশ সুবিধাভোগী মোড়লরা কখনোই চান না সাধারণ মানুষ সুশিক্ষিত ও সচেতন হোক। এ প্রসঙ্গে প্যারেন্টি লিখেছিলেন, '... ... ... স্বল্প আয়ের তরুণরা সরকারি সম্পদের গণমুখী পুনর্বণ্টনের মাধ্যমে সংগঠিত হচ্ছে, এটা দেখার চেয়ে এই রক্ষণশীলরা দেখতে চান যে, তরুণরা মাদকের নেশায় বুঁদ হয়ে আছে। আজকের তরুণদের আগের প্রজন্মের তরুণরা 'ইয়াং লর্ড', 'ব্ল্যাকস্টোন রেঞ্জার' এবং 'ব্ল্যাক প্যান্থার' সংগঠনে যোগ দিয়ে বিপ্লব নিয়ে মাথা ঘামিয়েছিল। নগরীর দরিদ্র মানুষ অধ্যুষিত এলাকার তরুণরা পূর্ববর্তীদের মতো বিপ্লব নিয়ে কথা না বলে বরং নিজেদের শরীরে মাদকের সুঁই ফোঁটাক এবং একজন আরেকজনকে গুলি করুক রক্ষণশীলদের কাছে সেটাই বেশি কাম্য। ... ... নিউ ইয়র্কের কৃষ্ণ অধ্যুষিত হার্লেম থেকে মধ্য আমেরিকার হন্ডুরাস পর্যন্ত সর্বত্রই, নিয়ন্ত্রণাধীনে আসতে অনিচ্ছুক জনসাধারণকে নিরুৎসাহিত ও অসংগঠিত রাখতে সাম্রাজ্য সকল কৌশলই গ্রহণ করে।'[৩৩] কিন্তু বৈষম্য যখন চরম সীমায় পৌঁছায় তখন কোনো কৌশল ও নিপীড়িত হওয়ার ভয় মানুষের ওপর কার্যকর করা যায় না। সামাজিক অনাচার যখন নিয়ন্ত্রণের মধ্যে থাকে, তখন মানুষের ক্ষোভ-বিক্ষোভকে কিছুদিন প্রশমিত রাখা যায়। কিন্তু অনাচার যখন অনিয়ন্ত্রিত ও লাগামহীন হয়ে ওঠে তখন আর গণঅসন্তোষকে রুখে দেয়া সম্ভব হয় না। আধিপত্যবাদের বহুপাক্ষিকতার কথা আগেই বলা হয়েছে। সাম্প্রতিক পুঁজিবাদের আধিপত্যের ক্ষেত্রও যেমন বৃদ্ধি পেয়েছে, তেমনি মানুষের অসন্তোষের পরিধিও বেড়েছে। বিশ্বব্যাপী আর্থিক বাজারের যথেচ্ছাচারবিরোধী, যুদ্ধবিরোধী, পরিবেশবাদী, গণতন্ত্রের দাবিতে, শিক্ষা-স্বাস্থ্য পরিচর্যার ও কর্মসংস্থানের সুযোগের দাবিতে, বিশ্বায়নবিরোধী, বর্ণবাদবিরোধী, রাষ্ট্রীয় নিপীড়নবিরোধী নানা অধিকার আদায়ের আন্দোলন আজকাল প্রাধান্য লাভ করেছে। বিশ্বায়নের প্রভাবে শোষণের পরিসর যেমন বেড়ে গেছে, তেমনি তথ্য-প্রযুক্তির আশীর্বাদে বিশ্বময় সে শোষণের চরিত্র প্রকাশিত হওয়ার প্রবণতাও বেড়ে গেছে। দীর্ঘদিন মানুষকে অন্ধকারে রেখে আর শোষণ চালিয়ে যাওয়াও সম্ভব হচ্ছে না। নিপীড়নমূলক সরকারগুলোর বিরুদ্ধে যেমন মানুষের গণআন্দোলন বৃদ্ধি পাচ্ছে, তেমনি নির্যাতিত দেশের সরকারগুলোও এখন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হচ্ছে। পরিবেশ সংকটের মতো আন্তর্জাতিক ঝুঁকির ক্ষেত্রগুলোতে দরিদ্র দেশের সরকারগুলোরও ঐক্যবদ্ধ হওয়ার ক্ষেত্র প্রস্তুত হচ্ছে। আগামী দিনগুলোতে এই প্রতিরোধ আরও জোরালো হবে। বর্তমান বাস্তবতা আমাদের সেই সত্যের দিকেই ধাবিত করে।

উপসংহার

মার্কসীয় বিশ্লেষণ অনুযায়ী, বিপ্লবের বস্তুনিষ্ঠ ও ব্যক্তিনিষ্ঠ উভয়বিধ শর্ত বিদ্যমান। বস্তুনিষ্ঠ শর্তটি মূল প্রভাবক হিসেবে ব্যক্তিনিষ্ঠ শর্তের উদগাতা। উৎপাদন ব্যবস্থায় গুণগত কোনো পরিবর্তন উপরিকাঠামোতেও বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনে। বদলে যায় মানুষের চিন্তা-চেতনা তথা মানস জগৎ। অতীতের উৎপাদন ব্যবস্থাতে পরিবর্তনের প্রাক্কালেও এসব লক্ষণ বিদ্যমান ছিল। পুরনো উৎপাদন ব্যবস্থার অকার্যকারিতা ও অন্তর্নিহিত দুর্বলতা নতুন উৎপাদন ব্যবস্থাকে অবশ্যম্ভাবী করে তোলে। তখন শাসক গোষ্ঠি আর পুরনো পদ্ধতিতে শাসন ক্ষমতা টিকিয়ে রাখতে পারে না, ফলে সে আরও নিপীড়নমূলক হয়ে ওঠে। সাম্প্রতিককালের পুঁজিবাদেও একই প্রবণতা লক্ষণীয়। মাত্র চারশো বছরের ইতিহাসে পূঁজিবাদকে দু'টি বিশ্বযুদ্ধ, একের পর এক আর্থিক সংকট, জিডিপি হ্রাসের প্রবণতা, নানাবিধ অনুৎপাদনমুখী ও মানব বিধ্বংসী অভিঘাতের মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে যা তার অবস্থানকে ক্রমাগত ভঙ্গুর ও নাজুক করে তুলেছে। পুঁজিবাদের ধ্রুপদী তত্ত্বের সঙ্গে এসব নতুন বৈশিষ্ট্য আদৌ সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। তাই সম্প্রতি উত্তর-পুঁজিবাদ শব্দটি ব্যবহৃত হচ্ছে। উত্তর পুঁজিবাদ বৈষম্যকে ক্রমশ বাড়িয়ে তুলছে। আশংকা করা হচ্ছেঃ এ বৈষম্য আগামী ৫০ বছরে আরও ৪০ শতাংশ বৃদ্ধি পাবে। ক্রমবর্ধমান এ আর্থিক সংকট জন্ম দিয়ে যাচ্ছে নতুন নতুন সামাজিক সংকট ও শ্রেণি বৈষম্যের। শোষণের বৈশ্বিক রূপ এ সংকটকে আন্তর্জাতিক রূপ দিয়ে যাচ্ছে। আধিপাত্যবাদ যেমন বহুপাক্ষিক, এর বিরুদ্ধে গড়ে ওঠা প্রতিরোধ আন্দোলনও তেমন বহুপাক্ষিক হয়ে উঠেছে। শ্রেণি, জাতি ও রাষ্ট্রের নানা জটিল অভিঘাতে আজকের বৈশ্বিক আন্দোলনগুলো ক্রিয়াশীল। সুতরাং, তার বহুমূখী প্রভাব আগামী দিনের সমাজ, রাষ্ট্র ও বিশ্বব্যবস্থাকে বদলে দেবে মৌলিকভাবে। ইতিহাস ও ইতিহাসের বস্তুবাদী দর্শন আমাদের সেই শিক্ষাই দেয়।

তথ্যসূত্র

১. মাইকেল প্যারেন্টি, অনু. ওমর তারেক চৌধুরী, *সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে*, ঢাকা: তৃতীয় শ্রাবণ মুদ্রণ, ২০০৫, পৃ. ১৪৪।

২. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪৯।

৩. V. Afanasyev, *Marxist Philosophy: A Popular Outline*, (ed. by George Hanna), Moscow: Progress publishers, 3rd ed., 1968, p. 284.

৪. *Ibid*, p. 285.

৫. আনু মুহাম্মদ, 'মন্দের ভালো বারাক ওবামা', *দৈনিক প্রথম আলো*, ২০১২, ৬ নভেম্বর, ১৩।

৬. Samir Amin, Tr. by Patrick Camiller, *Obsolescent Capitalism*, London & New York : Zed Books Ltd., 2003, pp. 24, 26.

৭. হায়দার আকবর খান রনো, *ফরাসী বিপ্লব থেকে অক্টোবর বিপ্লব*, ঢাকা: তরফদার প্রকাশনী, ২০০৭, পৃ. ৩৩০।

৮. V. Afanasyev quotes from V.I. Lenin's *Selected Works,* vol.3, p.430 in his *Marxist Philosophy: A Popular Outline*, p. 306.

৯. Samir Amin, *Obsolescent Capitalism*, pp. 63-4.

১০. *Ibid*, pp. 42-3.

১১. *Ibid*, pp. 93-4.

১২. হাসান ফেরদৌস, "ওবামার আমেরিকায় শ্রেণীযুদ্ধ", *দৈনিক প্রথম আলো*, ২০১২, ২৩ নভেম্বর, ১৩।

১৩. প্রদীপ বসু, *উত্তর আধুনিক রাজনীতি ও মার্কসবাদ*, কলকাতা: পুস্তক বিপণী, ২০০৫, পৃ. ২৪৮।

১৪. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩২-৩৩।

১৫. V. Afanasyev, *Marxist Philosophy: A Popular Outline*, p. 306.

১৬. Thomas W Pogge quotes from World Bank's *World Development Report 2003*, (2003, 235) in his "Moral Universalism and Global Justice", in *Globalisation and Equality*, 2006, p. 55.

১৭. প্রদীপ বসু, *উত্তর আধুনিক রাজনীতি ও মার্কসবাদ*, পৃ. ২৩২।

১৮. J.C. Johari quotes from Mathew Arnold's "Lecture on Equality", in *Mixed Essays* (1903, pp.48-97) in his *Contemporary Political Theory: New Dimensions, Basic Concepts and Major Trends*, 1995, pp. 308-9.

১৯. আলী রীয়াজ, "নাগরিক অধিকারের সংগ্রাম এখনো শেষ হয়নি", *দৈনিক প্রথম আলো*, ২০১৪, ৭ ডিসেম্বর, ১০।

২০. J.C. Johari, *Contemporary Political Theory: New Dimensions, Basic Concepts and Major Trends*, New Delhi: Sterling Publishers Private Limited, 1995, p. 643.

২১. প্রদীপ বসু, *উত্তর আধুনিক রাজনীতি ও মার্কসবাদ*, পৃ.২৩১-৩২।

২২. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩৫।

২৩. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩২।

২৪. হাসান ফেরদৌস, " 'নির্যাতন প্রতিবেদন' মুখোশ খুলে দিল মার্কিন সরকারের", *দৈনিক প্রথম আলো*, ২০১৪, ১৪ ডিসেম্বর, ০১।

২৫. V. Afanasyev, *Marxist Philosophy: A Popular Outline, Loc. cit.*

২৬. আলী রীয়াজ, "আমেরিকান রাষ্ট্র ও সমাজের গভীর ক্ষত", *দৈনিক প্রথম আলো*, ২০১৪, ২৩ আগস্ট, ১১।

২৭. হাসান ফেরদৌস, "বর্ণবাদের বিরুদ্ধে নাগরিক সংহতি", *দৈনিক প্রথম আলো*, ২০১৪, ৯ ডিসেম্বর, ০১।

২৮. *দৈনিক প্রথম আলো*, "সামরিক ব্যয় কমাতে পারবে যুক্তরাষ্ট্র?", ২০১৩, ৩০ এপ্রিল : ০৮।

২৯. *দৈনিক প্রথম আলো*, "যুক্তরাষ্ট্রে আয়বৈষম্য এখন সর্বোচ্চ", ২০১৪, ১৯ ডিসেম্বর : ১৫।

৩০. Michael Parenti, "Reflections on Politics and Academia: An Interview with Michael Parenti", Interviewed by Carl Boggs in the academic Journal *New Political Science*, Available from www. Michael Parenti. org. [Accessed 2012].
৩১. Samir Amin, *Obsolescent Capitalism*, p.78.
৩২. জোসেফ. ই স্টিগলিৎজ, অনু. প্রতীক বর্ধন, "অসমতা ও মার্কিন শিশু", *দৈনিক প্রথম আলো*, (প্রজেক্ট সিন্ডিকেট থেকে সংগৃহীত), ২০১৪, ২৫ ডিসেম্বর, ১০।
৩৩. মাইকেল প্যারেন্টি, *সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে*, পৃ. ১১৯-২০।

[**Abstruct:** This article analyse the contemporary relevance of the idea of world revolution under the guidance of Marxist-Leninist theory. To verify the conditions of revolution, prescribed by Lenin, open up some criterion of capitalist world system, like market inconsistencies, economic inequality, poverty, exploitative role of the state, refugee problem, racism and various crisis of war economy. This reality proves that internal conflict of capitalism is incrising in the highest degree in this age of Neo-conservatism.]